মুসলিম যুবকদের
কীর্তিগাঁথা
যেমন ছিল উম্মাহর যুবকেরা
শাইখ নিদা আবু আহমাদ

যুবকদের ঘুম ভাঙাতে উম্মাহর শ্রেষ্ঠ যুগের শ্রেষ্ঠ যুবকদের লাইফস্টাইল ও তাঁদের যৌবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোর তেজোদ্দীপ্ত ঘটনাসমূহ কলম ও কালির অনবদ্য উপস্থাপনায় তুলে এনেছেন মিশরের বর্তমান সময়কার আলোচিত আলেমে দ্বীন শাইখ নিদা আবু আহমাদ। বইটি ভাষান্তর করেছেন ভাই মুহিব্বুল্লাহ খন্দকার। প্রাঞ্জল ভাষায় সম্পাদনা করেছেন ভাই সাজেদুল ইসলাম ও রাজিব হাসান।

আমরা আশা করি, উম্মাহর যুবকদের এই ক্রান্তিলগ্নে বইটি পুনরায় আশা জাগাবে। বইটি পড়ে মুসলিম যুবকদের মাঝে গাইরত ও শৌর্যবীর্য ফিরে আসব। তারা চিনতে পারবে তাদের উত্তরসূরীদেরকে। যারা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শক্তিতে-বুদ্ধিতে, স্বভাবে-প্রভাবে ছিলো সবার চাইতে এগিয়ে। বইটি পড়ে আমাদের যুবকেরা চিনতে পারবে তাদের রোল মডেলদেরকে। লাল-নীল দুনিয়া ছেড়ে ফিরে আসবে তামাটে মাটির সত্য পানে।

সে লক্ষ্যে বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছে আযান প্রকাশনী, ইন শা আল্লাহ! ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ!

"মহান আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু"

মূল :
শাইখ নিদা আবু আহমাদ

ভাষান্তর :
মুহিববুল্লাহ খন্দকার

সম্পাদনা :
মুহাম্মাদ সাজেদুল ইসলাম, রাজিব হাসান

‘রিসালাতুম মুহিম্মাহ লিশাবাবিল উম্মাহ’ গ্রন্থের অনুবাদ

যেমন ছিল উম্মাহর যুবকেরা

মুসলিম যুবকদের কীর্তিগাঁথা

(যেমন ছিল উম্মাহর যুবকেরা)

প্রথম প্রকাশ

শাবান, ১৪৪২ হিজরি / মার্চ, ২০২১ ঈসায়ী

মুদ্রিত মূল্য : ১৪৬

পরিবেশক

মাতৃভাষা প্রকাশ

১১, পি. কে. রায় রোড

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি, ওয়াফী লাইফ, আবাবিল বুকশপ, Tariqzone.com,
Salafibooksbd.com, Islamiboi.com

প্রকাশক

আযান প্রকাশনী

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১০০০।

+৮৮ ০১৭ ৫৯৫৯ ৯০০৮, ০১৭ ১৭৩১ ৭৯৩১

azanprokashoni.2019@gmail.com

azanprokashoni

নেপথ্যে উদ্দেশ্য

স্বাভাবিকভাবে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, যুবকদের ব্যাপারে এত আলোচনা ও পর্যালোচনা কেন? আচ্ছা, এবার তাহলে গোটা ব্যাপারটা খোলাসা করা যাক। নিম্নোক্ত দশটি কারণেই মূলত যুবকদের নিয়ে এতশত কথা—

১. যুবকদের দ্বারা শত্রুদের কী উদ্দেশ্য-অভিসন্ধি তা জানা।

২. দ্বীন সুরক্ষায় ও তার নিশান উড্ডয়নে যুবকদের কীর্তিগাঁথা জানা।

৩. দ্বীন প্রচারে যুবকদের ভূমিকা সম্পর্কে জানা।

৪. ইলমের প্রচার-প্রসারে যুবকদের আত্মত্যাগ সম্পর্কে জানা।

৫. যুবকদের দ্বারা আমাদের নেতৃত্ব এবং শাসন যেন ফের ফিরে আসে তার তাৎপর্য অনুধাবন করা।

৬. মুসলিম যুবকদের দুরাবস্থার সম্পর্কে জানা।

৭. যৌবনকাল—আমল করার শ্রেষ্ঠ সময়; তাই এই সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা।

৮. যুবকদের সময়ের অবমূল্যায়ন করা থেকে বিরত থাকা এবং সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা।

৯. কিয়ামতের দিন যৌবনকাল সম্পর্কে মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে তাই আগে থেকে তার প্রস্তুতি গ্রহণের তাৎপর্য সম্পর্কে জানা।

১০. যুবসমাজের অবক্ষয়ের স্বরূপসন্ধান।

উল্লেখকৃত দশটি বিষয়ের ভিত্তিতেই এই গোটা বইটিকে সাজানো হয়েছে।

প্রকাশকের কথা

বইটি নিয়ে কাজ করার সময় আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠতো চেনা পরিচিত কিছু যুবক ভাইয়ের মুখ। যারা বেহুদা ঘুরে বেড়ায়, মোবাইল টিপে, টিভির সামনে বসে রাতভর আইপিএল আর লা-লীগা দেখে ফজরের সময় ঘুমিয়ে যায়। যারা দিনরাত টিকটক বানায়, পাবজি ও ফ্রি-ফায়ার খেলে। মিডিয়া সেলিব্রিটিদেরকে আইডল বানিয়ে মেকি সুখে আটখানা হয়। যারা ইয়াবা, মদ আর গাঁজায় হারিয়ে যায়। তারা লাল-নীল দুনিয়ার আজিব তামাশায় বুঁদ হয়ে থাকে। যাদের জীবন মানেই তিনবেলা বাপের হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করা, বন্ধুদের সাথে আড্ডা পেটানো, বাইক নিয়ে ডজনখানেক মেয়েবন্ধুদের নিয়ে ঘুরে বেড়ানো। বেলাশেষে নরম বিছানায় গা এলিয়ে জম্পেশ ঘুম দেওয়া।

অথচ মুসলিম যুবকদের এরকম হবার কথা ছিলো না। এদের শৌর্যবীর্য এখনও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে জ্বলজ্বল করছে। সেই যে আসহাবে কাহাফের কতিপয় মুক্তিকামী যুবক, সেই যে আসহাবে উখদুদের সামনে ঈমানের বলে বলীয়ান ঈমানদার যুবক, সেই যে খালিদ বিন ওয়ালীদ, সেই যে উবায়দুল্লাহ বিন জাররাহ, সেই যে মুসাইব ইবনু উমাইর, সেই যে ইমাম শাফেঈ, ইমাম বুখারী, সালাহউদ্দিন, নুরুদ্দীন, মুহাম্মাদ বিন কাসিম -তাঁদের উত্তরসূরীরা আজ কোথায় হারালো? তারা আজ কোথায় ঘুমালো?

যুবকিদের ঘুম ভাঙাতে উম্মাহর শ্রেষ্ঠ যুগের শ্রেষ্ঠ যুবকদের লাইফস্টাইল ও তাঁদের যৌবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোর তেজোদ্দীপ্ত ঘটনাসমূহ কলম ও কালির অনব্যাদ উপস্থাপনায় তুলে এনেছেন মিশরের বর্তমান সময়কার আলোচিত আলেমে দ্বীন শাইখ নিদা আবু আহমাদ। বইটি ভাষান্তর করেছেন ভাই মুহিব্বুল্লাহ খন্দকার। প্রাঞ্জল ভাষায় সম্পাদনা করেছেন ভাই সাজেদুল ইসলাম ও রাজিব হাসান।

আমরা আশা করি, উম্মাহর যুবকদের এই ক্রান্তিলগ্নে বইটি পুনরায় আশা জাগাবে। বইটি পড়ে মুসলিম যুবকদের মাঝে গাইরত ও শৌর্যবীর্য ফিরে আসবে। তারা চিনতে পারবে তাদের উত্তরসূরীদেরকে। যারা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শক্তিতে-বুদ্ধিতে, স্বভাবে-প্রভাবে ছিলো সবার চাইতে এগিয়ে। বইটি পড়ে আমাদের যুবকেরা চিনতে পারবে তাদের রোল মডেলদেরকে। লাল-নীল দুনিয়া ছেড়ে ফিরে আসবে তামাটে মাটির সত্য পানে।।

সে লক্ষ্যে বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছে আযান প্রকাশনী, ইন শা আল্লাহ! ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ!

— আযান প্রকাশনী

লেখক পরিচিতি

শাইখ নিদা আবু আহমাদ একজন সুপ্রসিদ্ধ মিশরীয়া আলেমে দ্বীন। ১৯৬৩ সালের ১১ নভেম্বর তিনি কায়রোর জাওইয়াহ আল হামরায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি শামসু আইন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি আল-আজাহার বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হন। সেখান থেকে দাওয়া বিভাগের ডিগ্রি অর্জন করেন।

২০০৬ সালে তিনি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিসান্স দাওয়াহ ইসলামিয়া হাসিল করেন। বর্তমানে তিনি তাঁর লেখনীশক্তি ও বক্তৃতার মাধ্যমে দাওয়াহর কাজ করে যাচ্ছেন।

আল্লাহ্ তায়ালা শাইখের ইলমে বারাকাহ দিন। উম্মার কল্যানে তাঁর খেতমতকে কবুল করুন, আমীন।

সূচিকথন

যুবকদের সমীপে

তারিফ মহিয়ান-গরিয়ান রবের তরে। আমরা তাঁরই শুকরিয়া আদায় করি, তাঁর কাছেই আনুকূল্য কামনা করি এবং মাফি মাগি কেবল তাঁর তরেই। তাঁর কাছে আশ্রয় চাই—আমাদের নফসের অমঙ্গল ও আমলের খারাবি হতে। তিনি যাকে হিদায়াত দেন তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না; আর তিনি যাকে পথচ্যুত করেন তাকে হিদায়াত করার কেউ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে—আল্লাহ তাআলা এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই; এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসুল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যথাযথভাবে,
আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না।[১]

তিনি আরও বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً

হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ হতে সৃষ্টি করেছেন, আর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের দুজন হতে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।[২]

তিনি আরও বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য-সঠিক কথা বল। তাহলে তিনি তোমাদের আমলগুলোকে সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো মার্জনা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুসরণ করবে সে মহা সফলতা অর্জন করবে।[৩]

এ ধরার বুকে সবচেয়ে সত্য বাণী হল কালামুল্লাহ তথা আল কুরআন। আর সর্বোত্তম আদর্শ হল নবিজি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ। দ্বীনের মাঝে সর্বাধিক খারাপ বিষয় হল নব উদ্ভাবিত বিষয়। আর প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত বিষয় বিদআত, আর প্রত্যেক বিদআত হল ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণতি জাহান্নাম।

যদি কোন দেশ বা জাতির শক্তিমত্তা ও তার দুর্বল দিক সম্পর্কে জানার অভিপ্রায় হয়, তাহলে সে দেশের যুবকদের অবস্থার দিকে নজর দিন, এতে সহজেই তাদের অবকাঠামো জানা যাবে। যদি সে দেশের যুবকদের অবস্থান পাওয়া যায় যে—তারা দ্বীনদার, উত্তম ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার মানে উন্নীত তাহলে জেনে রাখুন, সে জাতি তথা দেশটি মজবুত ভিত্তি ও উঁচু মান-মর্যাদার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কোন পরাশক্তি সে দেশের দিকে লোলুপ দৃষ্টি দেওয়ার মতো দুঃসাহস করতে পারে না। সে জাতির টিকিটিও ছুঁতে পারেনা কোন বহিঃশত্রু।

আর যদি আপনি দেখতে পান যে—কোন জাতির যুবকেরা দ্বীন-ধর্মের ধার ধারে না, মন্দচরিত্র ও মূল্যবোধহীন অন্তরের অধিকারী এবং তারা অশিক্ষিত, বর্বর, ক্ষমতার প্রতি উদাসীন ও দুর্বলমনা; তাহলে বুঝে নিন ঐ জাতি ঠুনকো ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এমন জাতির উদাহরণ—দেহ হতে বিচ্ছিন্ন মাথার ন্যায়;

এবং সেই জাতি প্রবলবেগে ধ্বংসের দিকে ধাবমান। সেই দেশ ও জাতি ইসলামের শত্রুদের কাছে উন্মুক্ত খড়কুটোর মতো।

সুতরাং উচ্চ মনোবলের অধিকারী, সদা-সচেতন ও দ্বীনদার যুবকেরা দেশ ও জাতির প্রাণের স্পন্দন, তাদের টিকে থাকার অনুপ্রেরণা। তারা হল জাতির প্রবহমান টগবগে রক্ত, তারাই দেশের শিরা-উপশিরা। জাতির পূনর্জাগরণের মূলমন্ত্র; উন্নতি ও অগ্রগতির আধার। জাতির আগামী দিনের রাহবার ও তাদের ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা। এতশত কারণেই ইসলামে যুবকদের প্রতি যথেষ্ঠ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১০২
২। সূরা আন নিসা, আয়াত: ১
৩। সূরা আল আহযাব, আয়াত: ৭০-৭১

যুবকদের উপর উম্মাহর নির্ভরশীলতা

যুবসমাজ যখন দৃঢ়পদ থাকবে তখন সমগ্র জাতি দৃঢ়পদ থাকবে, নেতৃত্ব দেবে ও শাসন করবে। আর যুবসমাজের মাঝে যখন অধঃপতন আসবে, অকেজো হয়ে পড়বে তখন জাতিও তদ্রূপ হয়ে যাবে; হতোদ্যম ও অবনমিত হয়ে পড়বে। সুতরাং জাতির যুবকদের ঠিক থাকার উপর নির্ভর করে সমগ্র জাতির ঠিক থাকা।

দিনমানের ক্লান্তি ঠেলে রাতের বেলা মানুষ যখন গভীর ঘুমে ঢলে পড়ে তখন তার কাছে ছুটে আসে একজন ফেরেশতা এবং একজন শয়তান। হাদিসে রয়েছে, জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> 'কোনো ব্যক্তি যখন তার বিছানায় আসে তখন তার কাছে ছুটে আসে একজন ফেরেশতা ও একজন শয়তান। ফেরেশতা বলে, 'তুমি কল্যাণের সাথে রাত্রি পূর্ণ কর।' আর শয়তান বলে, 'তুমি অকল্যাণের সাথে রাত্রি

পূর্ণ কর।' যদি ব্যক্তিটি আল্লাহর নাম নিয়ে ঘুমায় তাহলে ফেরেশতা গোটা রাত তার সাথে থেকে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। অতঃপর যখন সে ঘুম হতে জেগে ওঠে তখন ফেরেশতা বলে, 'কল্যাণের সাথে দিন শুরু কর।' আর শয়তান বলে, 'অকল্যাণের সাথে দিন শুরু কর।'[১]

উপর্যুক্ত হাদিসটি আমাদেরকে বর্তমান যুগের যুবকদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। হালের হকপন্থি ও বাতিলপন্থি উভয় দলের লোকেরাই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রকাশ্যে-গোপনে যুবকদের নিয়ে ভীষণ তোড়জোড়ের সাথে মেহনত করে যাচ্ছে। বাতিলপন্থিরা জাহান্নামের দরজার দিকে যুবকদেরকে আহ্বান করছে, যেসব যুবক তাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে তারাই নিক্ষেপিত হচ্ছে অতল জাহান্নামে। বিপরীতদিকে, হকপন্থিরা যুবকদেরকে চিৎকার দিয়ে ডেকে ডেকে বলছে, এসো, তোমরা হিদায়াতের দিকে ফিরে এসো।

হকের দিকে আহ্বানকারীরা যুবকদেরকে হাত ধরে ধরে সত্যের দিকে নিয়ে যেতে নিরন্তর চেষ্টা-তদবির করে যাচ্ছে। বিপথগামীকে সঠিক পথ বাতলে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। হতাশাগ্রস্তদের সস্নেহে বুকে চেপে ধরে অনুপ্রেরণার বাণী শুনাচ্ছে যাতে তাদের হতাশার কালমেঘ কেটে আশার আলো উদ্ভাসিত হয়। তারা ঘুমন্তদের জাগিয়ে যাচ্ছে এবং উদাসীনদের সতর্ক করে যাচ্ছে। ইলমহীনাদের ইলম শিখাচ্ছে, পাপিদের দেখিয়ে যাচ্ছে আল্লাহর আজাবের ভয়। আনুগত্যশীলদের হাত মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরছে যাতে হকের উপর তারা দৃঢ়পদ থাকে এবং একতাবদ্ধ থাকে। আল্লাহ তাআলা তাঁর অশেষ দয়া ও ইচ্ছায় তাদেরকে ইমানের উপর অনড় রেখেছেন।

আল্লাহর কাছে কামনা করি যেন আমরা হকের ধারক-বাহক হতে পারি যেমনিভাবে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা কামনা করি কথা ও কাজে; প্রকাশ্যে ও গোপনে। আমিন।

তথ্যসূত্র:

১। সুনানুল কুবরা লিননাসায়ী: ১০৬৯০, মুসনাদে আবি ইয়ালা: ১৭৯১, মুস্তাদরাক লিল হাকিম: ২০১১। হাদিসটির সনদ সহিহ

১

শত্রুদের কূটবুদ্ধির চালে যুবকরা

ইসলামের শত্রুরা বিভিন্ন অবস্থা-প্রকৃতিতে যুবকদের ঘিরে ষড়যন্ত্রের বড় বড় জাল পেতে রেখেছে। কেননা তারা বেশ ভালো করেই জানে—যুবকরাই হল কোনো জাতির মূল স্তম্ভ বা ভিত্তি। তারাই জাতির শক্তির প্রধান উৎস; জাগরণের কেন্দ্রবিন্দু। মান-মর্যাদার ধারক-বাহক; ইতিহাস রচয়িতা। জাতির আগামী দিনের রাহবার, চালিকাশক্তি। জাতির ভবিষ্যত প্রত্যাশা কেবল তারাই। তাদের হাত ধরেই আসে সম্মান ও মর্যাদা। তাদের কারণেই বৃদ্ধি পায় সমগ্র জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব।

ইসলামের শত্রুদের ধ্রুব বিশ্বাস—যুবকরাই হল জাতির মেরুদণ্ড। তারা অভ্রান্ত থাকলে জাতি বিভ্রান্ত হয় না। তাদের দৃঢ়পদ থাকার কারণেই জাতি অটল-অবিচল থাকে, কেননা তারা তো জাতির স্তম্ভ বা খুঁটিস্বরূপ। তাদের দৃঢ়তার দরুন জাতি নেতৃত্ব দান করে, শাসনকার্য পরিচালনা করে। অন্যদিকে যুবসম্প্রদায়ের অধঃপতনের ফলে সমগ্র জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়; ভেঙে পড়ে জাতির মেরুদণ্ড। সুতরাং একটি সুস্থ-সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে দৃঢ়পদ যুবসমাজ হল শক্ত-পোক্ত ইটের ন্যায়। অন্যদিকে নষ্ট, ঘুণেধরা যুবসমাজের উদাহরণ হল, জাতিসত্তার দেহে ধ্বংসাত্মক এক কুঠারের ন্যায়, যা জাতিকে কেটে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয়।

সভ্যতা বিনির্মাণে যুবসমাজের গুরুত্ব ও জাতি প্রতিষ্ঠায় তাদের অবদান অপরিসীম—এই বিষয়টিকে খেয়াল করেই ইসলামের শত্রুরা যুবশক্তিকে ধ্বংস ও নিঃশেষ করে দেবার নীলনকশা আঁকে। তারা তাদের এ হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে মুসলিম যুবকদের চিন্তা-চেতনায় ঘুণ ধরিয়ে দিতে হরেকরকমের ফন্দি এঁটে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। হেন ষড়যন্ত্রে তুরুপের তাস হিসেবে তারা বেছে নেয়—বিভিন্ন ভ্রান্ত ও বাজে চিন্তাধারা, ভ্রমপূর্ণ মতাদর্শ, বাতিল ধর্মাবলম্বী ও পথভ্রষ্টকারী দাঙ্গি, নিকৃষ্ট ও বেহায়াপনায় ভরপুর নাটক-সিনেমা ও অশ্লীল

পত্র-পত্রিকা, চরিত্রহননকারী গান-বাদ্য এবং মুক্তচিন্তা নামের অসৎ-অসভ্য কাহিনিসূলভ গল্প-উপন্যাসসহ ইত্যাদিকে। মোটকথা, ইসলামের শত্রুরা সবধরণের কূট-কৌশল ও ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে কেবল মুসলিম যুবকদেরকে হিদায়াতের পথ হতে সরিয়ে তাদের রচিত বাতিল ধর্মের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

এসমস্ত ষড়যন্ত্রের ফাঁদ ও কুমন্ত্রণা যুবকদের চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকে হররোজ। আর তাদেরকে প্রতিনিয়ত কান পড়া দিতে থাকে যেন তাদেরকে সত্যের আওয়াজ হতে সরিয়ে রাখা যায়। তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলতে থাকে যে—এসো তোমরা আমার দিকে, এসো মদ ও শরাবের দিকে, এসো কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য। পার্থিব এসব বস্তুর জাল ও ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল—যুবসমাজকে বিনষ্ট করে দেয়া, তাদের মাঝে খারাবি, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার ছয়লাব ঘটিয়ে দেয়া।

অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আজ ইসলামের শত্রুরা তাদের সবধরণের কূট-কৌশল অবলম্বন করে শতভাগ সফল হয়েছে। তারা আজ যুবকদের নিজেদের হাতের পুতুল বানিয়ে ফেলছে। যুবকদের আত্মপরিচয় ও অস্তিত্ব বিলীন করে দিতে পুরোপুরিভাবে সক্ষম হয়েছে। সক্ষম হয়েছে যুবসমাজের ও সম্মিলিত জাতিসত্তার মধ্যকার সম্পর্ককে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে। আর এ গোটা বিষয়টিই আজ আমাদের চোখের সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। যা আলাদা করে বোঝানোর অবকাশ রাখে না।

অধিকন্তু হালের যুবসমাজের দিকে তাকালে দেখা যাবে—ভয় ও নিরাশা তাদেরকে পেয়ে বসেছে; জাতির সম্মুখে পাওয়া যাবে মুহ্যমান, আত্মপরিচয়হীন ও অধঃপতিত এক যুবসমাজ, যারা নিজেদের আত্মমর্যাদা খুইয়ে ফেলেছে। তাদের নেই কোন লক্ষ্য, নেই কোন উদ্দেশ্য। তাদের প্রথম ও প্রধান ইচ্ছে—মনগড়া চলা, কুপ্রবৃত্তিকে তুষ্ট করা, নারীর মায়ায় বুঁদ হয়ে জীবনের মূল্যবান সময়গুলো অকাতরে তাদের পিছে বিলিয়ে দেয়া, টিভিতে কিংবা অন্যকোনো ডিভাইসে গান-নাটক-সিনেমা-খেলাধুলা ইত্যাদি দেখে অহেতুক সময় নষ্ট করা এবং মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে নিজের পরমায়ুর নাশ তরান্বিত করা।

জাতির সম্মুখে মুহ্যমান এমন এক যুবপ্রজন্ম যারা কেবল নিজেদের কুপ্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার অনুসরণ করে। এমন এক যুবসমাজ যারা স্বীয় রব হতে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে। এমন এক যুবসমাজ, যারা বেড়ে উঠছে বিভিন্ন মাদকদ্রব্য ও অশ্লীলতাকে সাথে নিয়ে। তারা কেবল যত্নবান হয় নিজেদের বাহ্যিক সৌন্দর্য; পোশাক-আশাক ও সুগন্ধী গ্রহণে। এক্ষেত্রে মাঝে মাঝে তারা এতটাই বাড়াবাড়ি করে ফেলে যে, নারীদের সাথে তাদের সাদৃশ্য পর্যন্ত হয়ে যায়! এমন সংকীর্ণ ও মিহি কাপড় পরে যার দরুন তারা পুরুষ সত্ত্বা থেকে নারী সত্ত্বার নিকটে পৌঁছে যায়। একটা কথা আছে,

নারী সেজেছে পুরুষ, এটা নয়তো আশ্চর্যের,
পুরুষ সেজেছে নারী, এটা অপমান তার বীর্যের।

জাতির নিপতনের অন্যতম কারণ হল—ইদানীং এর যুবকদের সুনির্দিষ্ট কোন অভিপ্রায়-অভিসন্ধি নেই। যুবকদের যখন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হারিয়ে যাবে তখন তাদেরকে দেখা যাবে দোদুল্যমান, দিকশূন্য; তাদের সুনির্ধারিত কোন গন্তব্যস্থল নেই, তারা যেন কোনো এক অচেনা পথের পথিক। আজ মুসলিম জাতির মাঝে এমনই যুবসমাজ মওজুদ, যারা সময় পার করে নফসের খাহেশাত নিয়ে। আর তাদের জীবনের সর্বোচ্চ অভীষ্ট লক্ষ্য হয়—যুবতিদের অবৈধ ভালবাসা পাওয়া কিংবা গান-বাজনা শোনা অথবা কোন অভিনেতার চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পাওয়া।

সুতরাং এই সকল যুবকেরা তাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে হারিয়ে ফেলেছে। ফলে তারা অনুভব করতে পারছে না শত্রুপক্ষ তাদের থেকে ঠিক কি চায়, আর কেনই-বা ওরা তাদের পেছনে পড়ে আছে এটাও তারা বুঝতে পারছে না। তরুণরা তাদের সকল কাজের তদারকি ছেড়ে দিয়েছে অরির হাতে, যাতে করে তারা তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। অতঃপর এই শত্রুরা ইসলামকে কাটছাঁট করে যুবকদের সামনে তুলে ধরে এবং যুবসমাজের চেতনা বিনাশের অপতৎপরতা চালায়। মুসলিম যুবকদের আকিদা-বিশ্বাস ও দ্বীন-ধর্মকে বিনষ্ট করার জন্য সবধরণের হীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই শত্রুরাই। অথচ এই দ্বীন-ধর্মই ছিল তাদের সকল বিষয়ের পবিত্রতা, পাপমোচন এবং ইহ-পরকালীন নাজাতের মাধ্যম।

তাই মুসলিম যুবকদের জন্য আবশ্যক হল, শত্রুদের ষড়যন্ত্রের নীলনকশার ছক ও মুসলিম জাতির উপর আসু বিপদ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হওয়া। আমরা বিশ্বাস করি—যুবকরা হল উন্নতি, অগ্রগতির প্রধান সোপান। তারা অদম্য সাহসী, পরিচ্ছন্ন মেধা ও বুদ্ধিমত্তার আধার। তারা দুর্দমনীয় ক্ষমতার অধিকারী ও স্বীয় কাজে ভীষণ উদ্যমী। আর এসকল গুণ তাদেরকে উম্মাহর পরিচালনা এবং সমাজ-সভ্যতা বিনির্মাণে অধিকতর যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলে।

উল্লিখিত কারণসহ আরো বিভিন্ন কারণে হকপন্থি ও রাব্বানি উলামাগণ যুবকদের অন্তরে পুনরায় ইমানের নূর প্রাণবন্ত করার লক্ষ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। একইসাথে যুবকদের দ্বীন-দুনিয়া ধ্বংসকারী বিষয়সমূহকে প্রতিরোধও করে যাচ্ছেন। তারা প্রতিনিয়ত সতর্ক করে যাচ্ছেন বিভিন্ন বয়ান-বক্তৃতা, পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকের মাধ্যমে। যুবাদের থেকে সমস্ত খারাবি দূরীভূত করে সুকৃতি ও কল্যাণকে ফিরিয়ে এনে তাদেরকে উম্মাহর কাজে লাগানোর ফিকির করছেন।

আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার নিকট দুয়া করি—তিনি যেন আমাদের তরুণ সম্প্রদায়কে ও সমগ্র মুসলিম জাতিকে সকল প্রকার অনিষ্ট হতে রক্ষা করেন। আমিন।

২

দ্বীন সুরক্ষায় যুবকদের কীর্তিগাঁথা

যুবকরা হল বর্মসদৃশ—যা জাতিকে রক্ষা করে শত্রুদের তীর থেকে এবং প্রস্তরখণ্ডের ন্যায়—যা শত্রুদের অশুভ বাসনা ও হীন স্বপ্নকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়।

যারা দ্বীন-ইসলামের নিশানকে ধারণ করেছে, যারা বিভিন্ন সমরাঙ্গনে সৈন্যদল পরিচালনা করেছে, যারা বিভিন্ন ভূখণ্ড জয় করেছে এবং যারা পৃথিবীর পুব থেকে পশ্চিম চষে বেড়িয়েছে—তারাই তো ছিল প্রকৃত দ্বীনদরদি; দ্বীনের বিজয়কেতন উড্ডীন করতে ও দ্বীনের কালিমাকে সমুন্নত করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকা একটি যুবসমাজ।

যুবক সাহাবাদের জীবনচরিত থেকে কিছু নিদর্শন

আমাদের পূর্বসূরি তথা সালাফ আস সালিহিনরা জিহাদের ময়দানেও সংসক্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। অথচ তাদের মাঝে এমনও ছিলেন যাদের বয়স বিশের কোঠাও পার হয়নি। এরকম অল্পবয়সী বেশ ক'জন সাহাবাদের গল্প এবার তাহলে শোনা যাক।

আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উহুদ যুদ্ধে যেতে নিষেধ করেন। অবশ্য পরবর্তীতে খন্দক যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দান করেন। তখন তাঁর বয়স সবে পনেরোর কোঠায় পৌঁছে ছিল।[১]

উসামা ইবন যায়দ ও বারা ইবন আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা

উসামা ইবন যায়দ ও বারা ইবন আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা দুজনেই জিহাদে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, কিন্তু তাদের সাথেও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথারীতি একই ব্যবহার করেছিলেন। তাঁরা বয়সে ছোট হওয়ার দরুন তাদেরকে যুদ্ধে যেতে বারণ করেন।

যায়দ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন যায়দ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স ছিল মাত্র এগারো বছর। তাবারানিতে সহিহ সনদে এমনই বর্ণনা পাওয়া যায়। যায়দ ইবন সাবিত একসময় বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরাবরের মতো তাকেও বয়সে ছোট বলে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করলেন। কেননা তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র তেরো বছর। বছরখানেক পর উহুদ যুদ্ধের ঘোষণা হয়। যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স তখন চৌদ্দ। এবার তিনি উহুদ যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এবারও বারণ করেন। অতঃপর খন্দক যুদ্ধে পনেরো বছর বয়সে যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমবারের মত জিহাদে অংশগ্রহণ করেন।

উমাইর বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছোট ভাই উমাইর বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বদর যুদ্ধে অংশ নেয়ার ইচ্ছে পোষণ করেন। তখন তাঁর বয়স চৌদ্দ কিংবা ষোল বছর হবে। অল্প বয়সী হবার কারণে নবিজি তাকেও জিহাদে যেতে বারণ করলেন। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা; জিহাদে সে যাবেই। সুতরাং তাকে জিহাদে যাবার অনুমতি দিতে হবেই। একপর্যায়ে সে ভীষণ কান্না জুড়ে দিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগত্যা তাঁর কান্না দেখে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিয়ে দিলেন। সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'উমাইর তাঁর তরবারির

তুলনায় ছোট হওয়ার দরুন তরবারির ফিতা তাঁর হাতে বেঁধে দিয়েছিলাম।' আর এ মহান বীর নওজোয়ান বদর যুদ্ধে শহিদ হয়েছিল। তাকে শহিদ করে আমর বিন আবদ উদ নামীয় কুরাইশের এক নেতা।[২]

এক অসাধারণ উৎসর্গের আত্মকাহিনি

অল্প বয়সী হওয়ার কারণে রাফি বিন খাদিজ ও সামুরা বিন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধে যেতে বারণ করেছিলেন। তখন তাদের বয়স ছিল মাত্র পনেরো বছর। কেউ একজন নবিজিকে বললেন—'রাফি তো খুব ভালো ছুঁড়তে পারে।' তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাফি বিন খাদিজকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিয়ে দেন। রাফি অনুমতি পেয়ে গেছে দেখে সামুরা নবিজির কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি তাকে অনুমতি দিয়েছেন অথচ আমাকে দেননি! আমি যদি রাফির সাথে কুস্তি করি তাহলে তাকে আমি ধরাশায়ী করে ফেলব।' অবশেষে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা শুনে তাকেও অনুমতি দিয়ে দেন।

যুদ্ধে রাফি বিন খাদিজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বুক বরাবর একটি তীর এসে বিদ্ধ হয়। অতঃপর সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন—'তুমি যদি চাও তাহলে আমি তীর ও বর্শার ধারালো অংশ সরিয়ে দিতে পারি, আর যদি তুমি চাও তাহলে আমি কেবল তীর সরিয়ে বর্শার ধারালো অংশ রেখে দিব এবং তোমাকে কিয়ামত দিবসে শহিদ হিসাবে সাক্ষ্য দিব।' ইতিমধ্যে রাফি বিন খাদিজ রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন কথা বলল, যা দ্বারা সে জান্নাতি হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সে বলল —'হে আল্লাহর রাসুল! তীর সরিয়ে, বর্শার ধারালো অংশ আমার শরীরেই রেখে দিন।' কথামতো তাই করা হল। একসময় শরীরের ক্ষতগুলোও মিলে গেলেও পরবর্তীতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমলে তা আবার তাঁর শরীরে ভেসে ওঠে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষ্য অনুসারে তাঁর শহিদি মৃত্যু হয়।[৩]

"তারাই মোদের পূর্বসূরী পারলে দেখাও তাদের জুড়ি;
আমাদের মাঝে সমন্বয় ঘটেছে তাঁদের চরিত্রের বাহাদুরি।"

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বীরত্বের নিদর্শন

আলি ইবন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু, যাকে বলা হয় আসাদুল্লাহ—আল্লাহর বাঘ। অধিকাংশ যুদ্ধ ও অভিযানে তার হাতেই পতাকা থাকতো। বদর যুদ্ধের দিনেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে পতাকা হস্তান্তর করেছিলেন যখন কিনা তার বয়স ছিল সবে কুড়ি বছর।[৪] এমনিভাবে খায়বার যুদ্ধের দিনেও তিনিই ছিলেন ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী।

বদর যুদ্ধে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু শাইবা বিন রবিআর সাথে সম্মুখসমরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাকে হত্যা করেন। অনুরূপভাকে, খন্দকের যুদ্ধেও তিনি কুরাইশের অশ্বারোহী আমর বিন আবদ উদ (যে উমাইর বিন আবি ওয়াক্কাসকে শহিদ করেছিল) এর সাথে টক্কর দিয়ে তাকেও হত্যা করে ফেলেন।[৫]

ইসলামের জন্য প্রথম তীর নিক্ষেপকারী

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের ব্যাপারে বলেন—'আমিই ইসলামের জন্য প্রথম তীর নিক্ষেপকারী।' তার বয়স ছিল তখন মাত্র সতেরো বছর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন—'তুমি নিক্ষেপ কর, আমার বাবা-মা তোমার জন্য কুরবান হোক!'[৬]

নবিজির জীবদ্দশায় প্রস্তুতকৃত শেষ অভিযানের সেনানায়ক

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় সর্বশেষ যে সারিয়া বা ছোট অভিযান প্রস্তুত করেন তার আমির ছিলেন উসামা ইবন যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু। উসামার বয়স ছিল তখন সতেরো অথবা আঠারো বছর। আর তাঁর নেতৃত্বে এ সারিয়ায় শরিক ছিলেন উমার, উসমান, আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুম সহ

আরো অনেক বড় বড় সাহাবিগণ। উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স যেহেতু কম ছিল, তাই অনেকেই তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে আপত্তি জানায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিলেন—'তোমরা এর আগে তাঁর বাবা যায়দের নেতৃত্বের ব্যাপারেও আপত্তি জানিয়েছিলে!' নবিজি এ কথা বলে তাদের সবার মুখ বন্ধ করে দেন।

কিন্তু নিয়তির কি খেল! এই অভিযান প্রেরণের আগেই প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরজীবনে পাড়ি জমান। এরপর মুসলমানদের প্রথম খলিফা হন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। খিলাফত লাভের পর পরই তার সর্বপ্রথম কাজ ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত উসামার বাহিনীটি প্রেরণ করা। উসামা ইবন যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু অভিযান পরিচালনা করে নিয়ে যান বলকা ও মুতা নামক স্থানের দিকে। মুতা নামক স্থানে রোমান সেনাবাহিনীর সাথে মুসলিমবাহিনীর তুমুল লড়াই হয়। যুদ্ধে মুসলমানগণ রোমানদের পরাজিত করে বিজয়ের মুকুট ছিনিয়ে আনে। এ যুদ্ধে বহু বন্দি মুসলিমদের করতলগত হয়। ওদিকে মুসলিমদের প্রায় কারো কোন কষ্টই পোহাতে হয়নি। সবাই বলাবলি করতে লাগল—'আমরা এর আগে উসামার বাহিনীর চেয়ে অধিক শান্তিদায়ক কোন অভিযান দেখিনি!'[৭]

জনৈক কবি বলেছেন,

শোনো বীরদের কথা;
ষোলো-সতেরোতে দিয়েছেন তাঁরা জিহাদে দেহ ও মাথা।

হাদিসে এসেছে,

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের দিন বলেন—

'যে ব্যক্তি এই এই কাজ করবে এবং অমুক অমুক স্থানে যাবে তার জন্য রয়েছে এত এত...।' অতঃপর যুবকরা তাঁর দিকে দৌড়ে গেল, আর বয়স্করা পতাকার কাছে স্থির রইল। একসময় যখন তাদের বিজয় হয়ে গেল তখন যুবকেরা ছুটে গেল সেই জিনিসের জন্য যা তাদের জন্য নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। তখন বয়স্করা বলতে লাগল—তোমরা আমাদের ছাড়া যেওনা, কেননা আমরা তোমাদের সহায়তাকারী। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আয়াত নাজিল করেন,

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

'লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে গণীমত (যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ) সম্বন্ধে; বলুন, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের। সুতরাং তোমারা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুগত্য কর, যদি তোমারা মুমিন হও।'[৮]

এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধে যুবকদেরকে তিরস্কার করেননি, বরং তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে মদিনার বাইরে এসে যুদ্ধ করেন। নবিজি সাহাবাদেরকেও যুবকদের মতামতগ্রহণ ও তাঁদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে আদেশ দিয়েছেন। এজন্যই খলিফাতুল মুসলিমিন উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু যুবকদের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন। এ ব্যাপারে সালাফদের থেকেও উক্তি রয়েছে।

ইমাম ইবন শিহাব যুহরি রাহিমাহুল্লাহ যুবকদেরকে হাদিস পড়ানোর শুরুতে বলেন—'তোমরা তোমাদের কম বয়সের কারণে নিজেদেরকে তুচ্ছ মনে করো না। কেননা, উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে জটিল কোন বিষয় আসলেই তিনি যুবকদেরকে ডাকতেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করে তাদের স্মরণশক্তির সূক্ষ্মতা ও মেধার তীক্ষ্মতা যাচাই করতেন।'[১]

আবু জাহলের হত্যাকারীর কাহিনি

মুআজ বিন আমর বিন জামুহ ও মুআওয়াজ বিন আফরা (ইবনুল হারিস) এই দুজনের হাতেই মুসলিম উম্মাহর ফিরআউন আবু জাহলের ইহলিলা সাঙ্গ হয়।

সহিহ বুখারিতে আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—'আমি বদর যুদ্ধের দিন সৈনিক সারিতে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, আমার ডানে-বামে খুব কম বয়সের দুজন যুবক। তাদের মত অল্প বয়সী যুবকদের পাশে আমি নিজেকে মোটেও নিরাপদ বোধ করছিলাম না। এমতাবস্থায় তাদের একজন তার সাথি থেকে লুকিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'চাচাজি, আবু জাহল কোনটি আমাকে দেখিয়ে দিন তো।' আমি বললাম, 'ভাতিজা, তাকে পেয়ে তুমি কী করবে?' সে বলল, 'শুনলাম সে নাকি নবিজিকে গালি দেয়। আল্লাহর শপথ! আমি তাকে দেখলেই হত্যা করব, অন্যথায় নিজেই শহিদ হয়ে যাব।' এরপর দ্বিতীয় যুবকটিও তার সাথি থেকে লুকিয়ে আমাকে একই কথা জিজ্ঞেস করল। এতে করে নিজেকে আমি এতোটাই নিরাপদ মনে করে সন্তুষ্ট হলাম যে, দুজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মাঝেও আমি ততটুকু হতাম না। তারপর আমি তাদের দুজনকে ইশারায় আবু জাহলকে দেখিয়ে দিলাম। বললাম, 'ঐ হল সেই ব্যক্তি যাকে তোমরা খুঁজছ।' তখন তাঁর বাজপাখির ন্যায় তীব্রবেগে তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল। এরা ছিল আফরার দুই পুত্র।

এরপর উভয়ে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলো। নবিজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কে আবু জাহলকে হত্যা করেছে?' উভয়ে বললো, 'আমি করেছি, আমি করেছি।' তখন নবিজি বললেন, 'তোমরা কি

তলোয়ারের রক্ত মুছে ফেলেছ?' তারা বলল, 'না, মুছিনি।' নবিজি উভয়ের তলোয়ার দেখে বললেন, 'তোমরা দু'জনেই তো দেখছি তাকে হত্যা করেছ।' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জাহলের পরিত্যক্ত জিনিসপত্র মুআজ ইবন আমর ইবন জামুহকে প্রদান করলেন। কারণ মুআওয়াজ বিন আফরা যুদ্ধে শহিদ হয়ে যায়। উভয় কিশোরের নাম ছিল মুআজ ইবন আমর জামুহ এবং মুআওয়াজ ইবন আফরা।'[১০]

এবার সময় এসেছে একটু ভেবে দেখার। ঐ যুবক দুটির ব্যাপারে একটু চিন্তা করুন। যারা কেবল নবিজিকে গালি দেওয়ার কারণে দুরাচার আবু জাহলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে পড়েছিল। আমি বর্তমান সময়ের যুবকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আজ যখন ইসলামের শত্রুপক্ষ হতে আমাদের প্রাণের স্পন্দন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়া হয় তখন কি তোমরা নিজেদের চোখে তপ্তাশ্রু দেখতে পাও? শুনতে পাও কি কোনো গোঙানির আওয়াজ? নবি-প্রেমে তোমাদের অন্তরে কি অনুভব কর দহণ-যন্ত্রণা? নাকি গালভরে হাসতে থাকো? চোখ বুজে ঘুমিয়ে থাকো? আল্লাহর কসম! আমাদের একজনও বেঁচে থাকাবস্থায় যদি নবিজিকে গালি দেয়া হয় তাহলে রোজহাশরে আল্লাহর দরবারে আমাদের কোন অজুহাত টিকবে না।

সাদ বিন রুবাই রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক মহান আত্মত্যাগ

হাকিম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরি ও ইমাম বায়হাকি রাহিমাহুল্লাহ যায়দ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা নকল করেন; যায়দ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'উহুদের দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সাদ বিন রাবির খোঁজ নেওয়ার জন্য পাঠান। তিনি বলেন, 'তাঁকে দেখলে আমার পক্ষ থেকে সালাম দেবে আর বলবে, আমি (নবিজি) আপনাকে জিজ্ঞেস করেছেন, আপনি কেমন আছেন?' আমি নিহতদের মাঝে তাকে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে পেয়ে যাই যখন কিনা তিনি জীবনের অন্তিম নিঃশ্বাস টানছেন। বর্শা, তলোয়ার আর তীরের আঘাত সব মিলিয়ে তার শরীরে সত্তরটিরও বেশি যখমের চিহ্ন দেখতে পেলাম। তাকে আমি বললাম—'হে সাদ! রাসুলুল্লাহ আপনাকে সালাম

জানিয়েছেন আর বলেছেন যে আপনি কেমন আছেন তা আমাকে জানাতে।' তিনি উত্তরে বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তোমার উপর সালাম। নবিজিকে গিয়ে আমার এই কথাগুলো শুনিয়ে দাও যে, (আমি বলেছি) হে আল্লাহর রাসুল! আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি!' আর আমার আনসার জাতিকে বলো—'যদি তোমাদের একজনও প্রাণে বেঁচে থাকা অবস্থায় কোনো কাফির নবিজির কাছে পৌঁছুতে পারে, তবে আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোনো অজুহাতই চলবে না।' এইটুকু বলতে না বলতেই তার দম ফুরিয়ে যায়।'[১১]

তাবিয়ি যুবকদের কৃতিত্বগাঁথা

নবিজির সাথি সাহাবীদের অনুসারী তাবিয়িদের মাঝেও বীরত্বের আশ্চর্যজনক নিদর্শন পাওয়া যায়। যাদের ত্যাগ ও সাধনার ফলেই উম্মাহ বিজয়ী হয়েছে দিকদিগন্তে। ইসলামের নিশান উড়েছে ধরার একপ্রান্ত হতে অপরপ্রান্ত অব্দি।

হিন্দুস্থান বিজয়ী মুহাম্মাদ বিন কাসিম

মুহাম্মাদ বিন কাসিম আস সাকাফির ছিলেন বনু উমাইয়ার খিলাফতকালে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বীর ও বিজেতা। এই মহান যুবক বীর সিন্দ (পাকিস্তান) ও হিন্দুস্থান (ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে তৎকালে হিন্দুস্থান বলে বোঝানো হত) জয় করেন মাত্র সতেরো বছর বয়সে। এমনকি তাঁর বিজয়াভিযান পৌঁছে গিয়েছিল পৃথিবীর পূর্ব-দিগন্ত অব্দি।[১২]

কুতায়বা বিন মুসলিম

আরেক মুসলিম দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন কুতায়বা বিন মুসলিম। যিনি বিজয় করেছেন বেশ কয়েকটি দুর্গ। আর তাঁর বিজয়াভিযান পৌঁছে গিয়েছিল সুদূর চীন এবং বর্তমানের সোভিয়েত রাশিয়া পর্যন্ত। এসব যুদ্ধাভিযান পরিচালনার সময়ে তাঁর বয়স ত্রিশেরও বেশি হয়নি।[১৩]

কনস্টান্টিনোপল বিজেতা সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ

সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ ছিলেন একজন মহান নেতা এবং কুসতুনতুনিয়া (কনস্টান্টিনোপল)-এর বিজেতা। এই মহান বীর মাত্র ২২ কিংবা ২৫ বছর বয়সে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বহুবছর যাবত ইসলামি সাম্রাজ্য পরিচালিত হয় কনস্টান্টিনোপল (বর্তমানের আধুনিক তুরস্ক) হতে। আর একারণে তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুয়ার বরকত লাভ করেন।[১৪]

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ, বিশির আল গানাওয়ির বর্ণিত হাদিস নকল করে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—'অবশ্যই কুসতুনতুনিয়া বিজয় হবে। আর কতইনা উত্তম হবে তার আমির; কতইনা উত্তম হবে ঐ সেনাবাহিনী।'[১৫]

দ্বীন ইসলামের এই গৌরবগাঁথা ঐতিহ্য এবং উম্মাহর উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে যুবকদের গর্ব করা উচিত, অহংকার করা উচিত। তাদের জন্য আবশ্যক হল ইসলামের কল্পে ত্যাগস্বীকারকারী ও প্রাণোৎসর্গকারী সাহসী বীরদের অনুসরণ করা। সেসব বীরদের অনুকরণ করা, যারা ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত রেখেছেন শতাব্দির পর শতাব্দি।

হে যুবক, হে আমার আশার প্রদীপ,
ছিনে আনো সোনালি প্রভাত ঊষা,
হে বজ্রধ্বনী, কম্পন উঠাও শত্রু মনে,
ঘিরে যাক অমানিশা;
হে রক্ষাকবচ, দ্বীনকে রক্ষা করো,
বাড়াও জ্বালা বাড়াও মনের তৃষা।

সুতরাং, যুবকরাই জাতির ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা এবং আগামীদিনের কর্ণধার।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

هُوَ الَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِالۡهُدَىٰ وَدِينِ الۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ الۡمُشۡرِكُونَ

তিনিই ঐ সত্তা, যিনি তাঁর রাসুলকে পাঠিয়েছেন হিদায়াত এবং সত্য দ্বীন দিয়ে; যাতে করে তিনি এ দ্বীনকে অন্যান্য সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।[১৬]

ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাঁর দ্বীনকে অন্যান্য সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করবেন। এমনকি একসময় ইসলাম ব্যতীত অন্য আর কোন দ্বীনই থাকবে না।[১৭]

আয়াতে উল্লিখিত এ বিজয় হয়ত নবিজির সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে অথবা খুলাফায়ে রাশিদিন কিংবা বনু উমাইয়া বা বনু আব্বাস অথবা অন্য কারো শাসনামলে। মোদ্দাকথা, তার কিছুটা বাস্তবায়িত হয়েছে; যেমনটি ইতিহাস হতে জানা যায়। আশা করা যায় অতি শীঘ্রই তার পূর্ণ বাস্তবায়ন হবে, ইন শা আল্লাহ।

উপর্যুক্ত সম্ভাবনাটি রাসুলের একটি হাদিস দ্বারা আরো শক্তিশালী হয়ে যায়। ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা নকল করেন,

সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

> ‘নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার জন্য জমিনকে সংকুচিত করে দিয়েছেন। ফলে আমি পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম, সবদিক দেখে ফেলি। পৃথিবীর যতটুকু অংশ আমাকে সংকুচিত করে দেয়া হয়, আমার উম্মতের সাম্রাজ্য অচীরেই ততটুকু বিস্তৃতি লাভ করবে। আর আমাকে একটি লাল (স্বর্ণ) ও একটি হলদে (রৌপ্য) বর্ণের খাযানা দেওয়া হয়। আমি আমার উম্মতের

> জন্য রবের কাছে দুয়া করেছি, তিনি যেন তাদের ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়ে সমূলে ধ্বংস না করে দেন। তিনি যেন এমন কোন বিজাতি শত্রু তাদের ওপর চাপিয়ে না দেন যারা তাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে দেবে। আমার রব বলেন, 'হে মুহাম্মাদ! আমি যখন কোন সিদ্ধান্ত নেই, তখন তা রদ হওয়ার নয়। আমি আপনার উম্মতের বিষয়ে আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে, তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়ে নাশ করে দেব না। বিজাতি শত্রুকে তাদের ওপর কর্তৃত্বাধিকারী করব না যে তাদের সমূলে উৎখাত করে দিতে পারে যদিও সবদিক থেকে সকলেই তারা একত্রিত হয়ে আসে। তবে তাদের কতক কতককে ধ্বংস করবে এবং কতক কতককে বন্দি করবে।'[১৮]

আর এটা জানা বিষয় যে, হাদিসে উল্লিখিত বিজয় গোটা ভূমণ্ডলকে ইসলাম ঢেকে দেয়নি অর্থাৎ পুরো বিশ্বে ইসলাম পৌঁছেনি বা পৌঁছলেও তা ব্যাপকাকারে নয়। তবে অতি শীঘ্রই তা বেষ্টন করে নেবে, আল্লাহ তাআলা যখন চাইবেন তখন; যেমনটি সংবাদ দিয়েছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

ইমাম আহমাদ ও তাবারি বর্ণনা করেন,

> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'অবশ্যই এই দ্বীন পৌঁছে যাবে যেখানে দিন এবং রাত পৌঁছেছে। আর বাকি থাকবে না কোন কাঁচা-পাকা ঘর; আল্লাহ তাআলা সম্মানী ব্যক্তির ঘরে সম্মানের সাথে এই দ্বীনকে প্রবেশ করাবেন, আর অসম্মানী ব্যক্তির ঘরে অসম্মানের সাথে। সম্মানিত করবেন আল্লাহ তাআলা ইসলামকে দিয়ে এবং অসম্মানিত করবেন কুফর দিয়ে।'[১৯]

উপর্যুক্ত হাদিসটি পূর্বোক্ত হাদিসকে আরো দৃঢ় এবং স্পষ্ট করে দেয়। আর 'যেখানে দিন ও রাত পৌঁছেছে' বাক্যাংশটি একথার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে যে, ইসলাম খুব শিগগিরই পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। আর ইসলাম গোটা পৃথিবীর মাঝে ছড়িয়ে যাওয়াটাও ভীষণ সম্ভব। কেননা দিন-রাত উভয়টি তার মিলনস্থলে পৌঁছে গেছে। অথচ এখনো তা প্রমাণিত হচ্ছে না। ইন শা আল্লাহ, জলদিই যুবকদের হাতেই তার বাস্তবায়ন ঘটবে। সেই সাথে এটাও বোঝা যায় যে, পরিশেষে মুসলিম

উম্মাহর নেতৃত্ব যুবকদের হাতে চলে যাবে; ইন শা আল্লাহ। নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা তা আরো জোরালো হয়ে যায়,

> একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারপাশে বসে কয়েকজন সাহাবা লিখছিলেন। হঠাৎ কেউ একজন জিগ্যেস করলেন যে, 'দুটি দেশের মধ্যে কোন দেশ সর্বপ্রথম বিজিত হয়েছে? কুসতুনতুনিয়া (কনস্টান্টিনোপল) নাকি রোম (ইতালি)?' নবিজি উত্তরে বললেন, 'হিরাক্লিয়াসের দেশ সর্বপ্রথম বিজিত হয়েছে।' অর্থাৎ কুসতুনতুনিয়া।[২০]

কুসতুনতুনিয়া বাস্তবায়িত হয় সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহর শাসনামলে। যখন কিনা তার বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর। এখন আমরা দ্বিতীয় সুসংবাদের অপেক্ষায় আছি। আল্লাহ চাইলে যা খুব শিগগিরই দেখতে পারব। সুতরাং সমগ্র আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এই দ্বীনের ভবিষ্যৎ হল যুবসমাজের হাতে। যুবকরাই একদিন সেই ভবিষ্যতবাণী সত্য করবে ইন শা আল্লাহ।

তথ্যসূত্র:

১। সহীহ বুখারী, ২৬৬৪
২। সিয়ারু আলামিন নুবালা
৩। আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ড মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, ৪র্থ খন্ড।
৪। ইহকাকুল হাক, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৮, বিহারুল আনওয়ার, ৪১ খন্ড, পৃঃ ৭৯,
৫। হাকিম, মুস্তাদরাকুস সহীহাইন, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৩২, তারিখে বাগদাদ।
৬। ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ১২৯, ১৩০, ১৩১৭।
৭। সহীহ আল বুখারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং ৬১৬৫, আধুনিক প্রকাশনী।
৮। সুরা আল আনফাল, আয়াত: ০১, বায়হাকি: ১৩১৯৭
৯। জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি, ১/৮৫
১০। সহীহুল বুখারি, কিতাবুল মাগাযি, হাদিস নং ৩৯৮৮
১১। দালায়েলুন নাবুওয়াহ লিল বায়হাকি ৩/১১০৪, আল মুসতাদরাক লিলহাকিম
১২। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২য়পত্র, পৃষ্ঠা – ০৭
http://itibritto.com/biography-of-muhammad-bin-qasim/
১৩। খাত্তাব, মাহমুদ শীত (মৃত্যু ১৪১৯ হিজরি), কদাতুল ফাতহিল ইসলামি ফি বিলাদি মাওয়াউন্নাহার, পৃ-৩৮৫ (বৈরুত, দার ইবনি হাজম, ১৪১৮ হিজরি)
১৪। মুহাম্মদ আল-ফাতেহ: রোমান সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পরাজয়ের মহানায়ক।
https://bit.ly/৩qoW৫he
১৫। আল মুস্তাদরাক লিলহাকিম: ৮/৮৩০০
১৬। সুরা আত তাওবাহ, আয়াত: ৩৩

১৭। আহকামুল কুরআন, ২/৫০
১৮। জামিউত তিরমিজি: ২১৭৬, সহিহ মুসলিম ৪/২৮৮৯, মিশকাত ৫৭৪৯, মুসান্নাফ আবি শায়বা: ৩১৬৯৪, ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে হাসান সহিহ বলেছেন
১৯। আহমাদ, তাবারানি, হাকিম, বায়হাকি, মিশকাতুল মাসাবিহ: ৪২, শায়খ আলবানি মিশকাতের তাহকিকে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।
২০। সহীহ বুখারী, আহমাদ ৪/৩৩৫, হাদীস: ১৮৯৫৭; মুসতাদরাকে হাকেম ৫/৬০৩, হাদীস: ৮৩৪৯; মুজামে কাবীর, তাবারানী, হাদীস: ১২১৬

৩

দ্বীন প্রচারে যুবকদের সংসক্তি

যুগে যুগে যুবকরাই দ্বীনের নিশানকে উন্নীত করেছে এবং তার প্রচার-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কুরআনুল কারিম আমাদেরকে সেসব যুবকদের বেশ কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছে। এবার তাহলে সেসব যুবকদের গুটিকয়েক দৃষ্টান্ত দেখা যাক।

প্রতিমা সংহারী নবি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম হলেন সমগ্র মুসলিম জাতির পিতা। ইতিহাস তাকে মূর্তিসংহারী নবি হিসেবেও জানে। পবিত্র কুরআনে তাঁর ব্যাপারে বহুবার বলা হয়েছে। আল্লাহর খলিল নবি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যুবাস্থায় তাঁর সম্প্রদায়ের পূজনীয় প্রতিমাগুলো ভেঙে দিয়ে এক বড় মূর্তির কাঁধে কুড়াল লটকিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। যখন তাঁর সম্প্রদায় মেলা হতে ফিরে এসে তাদের প্রভূদের এহেন অবস্থা দেখল, তখন তারা বলতে লাগল,

سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ

“আমরা শুনেছি এমন এক যুবকের কথা যে, এসব মূর্তিগুলোর ব্যাপারে সমালোচনা করে।”[১]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন এই মূর্তি সংহারাভিযান শুরু করেন তখন ছিলেন একজন পূর্ণ যুবক। আর এসবের বিস্তারিত বর্ণনা হাদিস ও তাফসিরের বইগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বাবা ছিল একজন প্রখ্যাত মূর্তিপূজারী এবং মূর্তি বিক্রেতা। নবি ইবরাহিম তাঁর বাবা আজরকে মূর্তির উপাসনা করতে বারণ করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন—'ও বাবাই, আপনি কেন এমন রবের ইবাদত করছেন যে শুনেনা, দেখেনা?'

ইসমাইল আলাইহিস সালাম

ইসমাইল যাবিহুল্লাহ আলাইহিস সালাম তাঁর বাবা নবি ইবরাহিমের সাথে আল্লাহর ঘর কাবা শরিফ নির্মাণের কাজ করেছেন। সেসময় তিনি ছিলেন কমবয়সী যুবক। একসময় যখন আল্লাহ তাআলা নবি ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে তাঁর ছেলেকে কুরবানি করার আদেশ দিলেন তখন তিনি দয়াময় রবের ইচ্ছার কথা স্বীয় ছেলে ইসমাইলকে জানালেন। ইসমাইল আলাইহিস সালাম তখন বললেন, 'আপনি তাই করুন যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। আর ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে একজন পাবেন।' এই ঘটনার সময় ইসমাইল আলাইহিস সালাম একজন নওজোয়ান ছিলেন। আল্লাহর আদেশ নতশিরে পালন করেন, এতটুকুও ভান-ভনিতা করেননি।[২]

নবি মুসা আলাইহিস সালামের অনুসারী যুবকদল

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِۦ

সুতরাং কেউ ইমান আনয়ন করেনি মুসার প্রতি কেবল তার সম্প্রদায়ের কিছু লোক ছাড়া।[৩]

এই আয়াতের তাফসিরে, ইবন কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মুসার প্রতি ইমান আনয়নকারী লোকগুলিও ছিল যুবক।"

ইসলামের দিকে আহ্বান তথা দাওয়াতের ধারা শুরু হয় মূলত নবি নূহ আলাইহিস সালামের সময় হতে। তার আগে কেউ এই কাজের জন্য আদিষ্ট হননি। আর যারা এই মহান দায়িত্ব বহন করেছিল তারা অধিকাংশ ছিল যুবকশ্রেণি।

আসহাবে কাহফের কাহিনি

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَٰهُمْ هُدًى

নিশ্চয় তারা কয়েকজন যুবক, যারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।[৪]

ঈসা আলাইহিস সালামের উর্ধ্বলোক গমনের পরবর্তী কোনো এক সময়ে আসহাবে কাহফের ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল রোম সাম্রাজ্যের কোনো এক স্থানে। রোমের ক্ষমতায় তখন অধিষ্ঠিত ছিল এক জালিম বাদশাহ। তাফসিরে ইবন কাসিরে উল্লেখ আছে, যে অত্যাচারী বাদশাহর তাড়ায় একদল যুবক পালিয়েছিল তার নাম ছিল দাকইয়ানুস। পলাতক সেই যুবকদের সঙ্গে কিতমির নামক একটি কুকুরও ছিল। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'গুহাবাসীর সংখ্যা ছিল সাত।' কোনো কোনো বর্ণনা মতে, তাদের নাম ছিল—মুকসালমিনা, তামলিখা, মারতুনিস, সানুনিস, সারিনুনিস, জুনিওয়াস এবং কাস্তিতিউনিস। উল্লেখকৃত নামগুলো দেখে মনে হয়, তা হয়ত রোমান নামের আরবিকরণ।

যুবক সেই কাফেলার অপরাধ ছিল—তারা কেবল এক আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নিয়েছিল। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করত না।

আসহাবে উখদুদের কাহিনি

আসহাবে উখদুদ বা গর্তওয়ালাদের কাহিনি সম্পর্কে অনেক বর্ণনা বিদ্যমান। এর মধ্যে আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাটি এখানে তুলে ধরা হল—

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সত্তর বছর আগে ইয়েমেনের নাজরানে ইউসুফ জুনয়াস নামে এক জালিম বাদশাহ ছিল। সে এতটাই জালিম ছিল যে, নিজের রাজত্ব টিকিয়ে রাখতে গণমানুষের ওপর কালো-জাদু করে তাদেরকে বশ করে রাখত, যেন কেউ তার বিরুদ্ধে কোনোরকমের বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ করতে না পারে। দুরাচারী বাদশাহর এই কাজের জন্য এক বিখ্যাত জাদুকর ছিল যে মানুষের ওপর জাদু-টোনা চালাত এবং গ্রহ-নক্ষত্র দেখে বাদশাহকে ভবিষ্যতের খবরাখবর দিত। কিন্তু একসময় সেই জাদুকর বৃদ্ধ হয়ে পড়লে বাদশাহর কাছে আর্জি জানায় যেন তাকে একটা বুদ্ধিদীপ্ত বালক দেওয়া হয় যাকে সে মৃত্যুর আগে তার সকল বিদ্যাবত্তা শিখিয়ে-পড়িয়ে যেতে পারে।

বাদশাহর আদেশে তখন অনেক যাচাই-বাছাইয়ের পর আব্দুল্লাহ ইবন তামের নামক এক বালককে চয়ন করা হয়। অবশেষে রাজা তাকে সেই জাদুকরের কাছে বিদ্যা অর্জন করতে আদেশ দেয়। তো যথারীতি বালকটি ঐ জাদুকরের কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগল। তবে সেই আসা-যাওয়ার পথে জনৈক খৃষ্টান পাদ্রী বসবাস করত। উল্লেখ্য, তখনকার সময় খৃষ্টধর্মই ছিল সত্য ধর্ম। একপর্যায়ে বালকটি পাদ্রীর কথা-বার্তায় বেশ কিছুটা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। একসময় এই আসা-যাওয়ার পথে বালকটি পাদ্রীর কাছ থেকেও জ্ঞান অর্জন করতে থাকে। কিন্তু পাদ্রীর মজলিসে বসার দরুন বাড়িতে ফিরতে এবং জাদুকরের কাছে যেতে তার বেশ অনেকখানি দেরি হয়ে যেত। তাই উভয়পক্ষের লোকেরা যাতে সন্দেহ না করে, তার জন্য পাদ্রী তাকে শিখিয়ে দিল—যদি জাদুকর তাকে জিগ্যেস করে দেরি হল কেন, তবে বলবে বাড়ি থেকে দেরিতে ছেড়েছে, আর যদি বাড়ির লোকেরা দেরি হবার কারণ শুধায় তবে বলবে, জাদুকর দেরিতে ছেড়েছে এবং কোন অবস্থাতেই যেন তার (পাদ্রীর) কথা না বলে।

হঠাৎ একদিন সেই আসা-যাওয়ার পথে বালকটির সামনে এক হিংস্র জন্তু পড়ে

যে মানুষকে যাতায়াতে সমস্যার সৃষ্টি করছিল। তাই দেখে বালকটি তখন একটি পাথর নিয়ে মনে মনে বলল, যদি পাদ্রী সত্য হয় তবে যেন জন্তুটি মারা যায়, আর জাদুকর সত্য হয় তবে যেন জন্তুটি বেঁচে রয়। এরপর পাথরটির আঘাতে জন্তুর মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনার মাধ্যমে যুবকের ক্ষমতার কথা দিকেদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এতে রাজ দরবারের জনৈক অন্ধ ব্যক্তি এসে তার অন্ধত্ব মোচনের জন্য আবেদন করে। বালকটি তখন বলে, সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ তাআলা। তুমি সত্য ধর্ম গ্রহণ করলে আমি চেষ্টা করে দেখব। অন্ধ লোকটি এই শর্ত মেনে নিলে যুবক তার জন্য দুয়া করতেই সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায় এবং সত্য ধর্ম গ্রহণ করে নেয়।

এই সংবাদ বাদশাহর কানে যাবার পর উভয়কেই গ্রেফতার করা হয়। অন্ধ লোকটিকে সত্য ধর্ম ত্যাগ করাতে না পারায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বালকটিকে বহু নির্যাতন করার পর একপর্যায়ে সে পাদ্রীর নাম বলে দেয়। পাদ্রীকে ধরে আনা হলে করাত দিয়ে তার মাথা থেকে পা অব্দি চিড়ে হত্যা করা হয়। অতঃপর বালকটিকে নির্মমভাবে হত্যার জন্য বাদশাহ তাকে পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিল। কিন্তু যারা বালকটির সাথে পাহাড়ে গেল তারাই উলটো ভূকম্পনের ফলে পাহাড় থেকে পড়ে মারা গেল। বালকটি তখন একাই হেঁটেহেঁটে নিরাপদে রাজ্যে ফিরে এল। বাদশাহ তাকে পুনরায় হত্যা করার জন্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করার আদেশ দিল। কিন্তু যারা তাকে নিয়ে গেল তারাই বরঞ্চ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে পিতৃদত্ত প্রাণখানি খোয়াল এবং যথারীতি বালকটি নিরাপদে বাসস্থানে ফিরে এল।

বাদশাহ কোনোভাবেই তাকে হত্যা করতে পারল না। অবশেষে বালকটি রাজাকে বলল, 'তুমি কেবল আমার কথামতো কাজ করলেই আমাকে মারতে পারবে।' রাজা তখন তাতেই সায় দিল। এরপর বালকটি বলল, 'এই শহরের সবচেয়ে বড় মাঠে সকল মানুষকে জড়ো কর। অতঃপর তাদের সম্মুখে আমার তূণীর থেকে একটি তীর নিয়ে 'এই বালকের রবের নামে' বলে নিক্ষেপ করলেই আমি মারা যাব।' সে-মতে কাজ করা হলে বালকটির সত্যিই মৃত্যু হয়ে গেল। আর এই বিস্ময়কর ঘটনা দেখে কতিপয় কিছু দরবারী লোক ছাড়া সকলেই বলে উঠল, 'আমরা এই বালকের রবের উপর ঈমান আনলাম।'

অপ্রত্যাশিত এই ঘটনা দেখে বাদশাহ ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। একপর্যায়ে সভাসদদের কান-পড়ায় বিরাট বিরাট গর্ত খনন করে তাতে অগ্নিপূর্ণ করে ঘোষণা দেয়া হল, 'যে ব্যক্তি এই নতুন ধর্ম ত্যাগ না করবে তাকেই এই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে।' কিন্তু কেউই তাতে রাজী না হয়ে বরঞ্চ আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকেই বেছে নিল। কেবলমাত্র একজন নারী তার কোলের শিশুর কারণে আগুন ঝাঁপ দিতে ইতস্ততবোধ করছিল; তখন আল্লাহ তাআলা শিশুটির জবান খুলে দিলে সে বলে উঠল 'আম্মাজান, আপনি সত্যের উপর আছেন।' একথায় ঐ নারী নিশ্চিন্তমনে আগুনে ঝাঁপ দিল।(৫)

ইতিহাস আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছে আসহাবে রাসূলদের ব্যাপারে। সংবাদ দিয়েছে রাসুলের ঝাণ্ডা উন্নীতকারী ও তাঁর সাহায্যকারীদের ব্যাপারে। সুতরাং দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মুসলিম নওজোয়ানদের বাহুবলে। তাদের নিরলস চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে ইসলামের বিভাকিরণ ছড়িয়েছে গোটা ধরাব্যাপী। স্বয়ং নবিজির হাদিসে আমরা সেসব যুবকদের অজস্র কাহিনি জানতে পারি।

দ্বিতীয় আকাবায় বায়আত গ্রহণকারী যুবকদল

আকাবা নামক স্থানে দ্বিতীয়বার যে বায়আত সংঘটিত হয়েছিল তারা ছিলেন সবাই যুবক।

অল্পবয়সী মুসলিম যুবক

এমন বহু তরুণের ব্যাপারে আমরা জানতে পারি যে, তারা খুবই অল্প বয়সে ইসলামকে সত্য দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সর্বপ্রথম ইসলাম বরণকারী পুরুষ। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা। নবিজির (সাঃ) অন্তরঙ্গ বন্ধু। যার অবদান

ইসলামের জন্য ছিল সবচেয়ে বেশি। যিনি নিজের সর্বস্ব অকাতরে বিলিয়ে দেন শুধুমাত্র ইসলামের জন্য। এই মহান ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হন সাঁইত্রিশ বছর বয়সে। মিরাজের ঘটনা শুনার পর তিনি বিন্দুমাত্রও দ্বিধা না করে এক লহমায় তা সত্য বলে স্বীকার করেন। আর এজন্যই তাকে 'আস সিদ্দিক' তথা সত্যবাদী বলা হয়।[৬]

আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু

আমিনুল উম্মাহ তথা এই উম্মাহর বিশ্বস্ত ব্যক্তি আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম বরণ করেন বত্রিশ বছর বয়সে। কেবল আবু উবাইদাহই তাঁর গোত্রের একমাত্র ইসলাম-গ্রহণকারী ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমদিকের অন্যান্য মুসলিমদের মতো আবু উবাইদাহও তীব্র অপমান ও অসহ নির্যাতন ভোগ করেন। তিনি মদিনায় মুআজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রথমবার আবিসিনিয়ায় হিজরতের পর মক্কার মুসলিমদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই বাকি মুসলিমদের আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে বলেন। এ-সময় ৮৩ জন পুরুষ ও ২০ জন নারীর একটি দলের সাথে আবু উবাইদা হিজরত করেন।[৭]

আবদুর রহমান বিন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি আবদুর রহমান বিন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম বরণের সময় তাঁর বয়স ছিল বছর ত্রিশেক। তার মূল নাম ছিল আবদুল আমর (আমরের দাস)। ইসলাম-গ্রহণের পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাম রাখেন আবদুর রহমান; যার অর্থ হল রহমানের বান্দা।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদুর রহমান ইবন আওফকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং নবিজির সাথে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ জানান। কালবিলম্ব না করে তখনি তিনি ইসলাম-গ্রহণ করে ধন্য হন। আবদুর রহমান ইবন আওফ ইসলাম-গ্রহণকারী প্রথম আটজন ব্যক্তির অন্যতম।

৬১৪ সালে মক্কার কুরাইশরা সদ্য মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা দেখানো শুরু করে। মুসলিম সদস্য আছে এমন গোত্রগুলো হামলার স্বীকার হয়। মুসলিম ব্যবসায়ীদের প্রতি সাধারণ হুমকি ছিল—আমরা তোমাদের পণ্য বর্জন করব ও তোমাদের ভিক্ষাবৃত্তি করতে বাধ্য করব।

আবদুর রহমান ইবন আওফ আবিসিনিয়ায় হিজরত করা পনেরজন মুসলিমের অন্যতম। অন্য মুসলিমরা পরে তাদের সাথে যোগ দেয়। সেখানে তারা নিরাপদে অবস্থান করতে থাকে। ৬১৯ বা ৬২০ সালের প্রথমদিকে তারা সংবাদ পান যে, মক্কার লোকেরা ইসলাম বরণ করেছে। মক্কায় ফিরে আসা চল্লিশ জনের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। কিন্তু মক্কার কাছাকাছি এসে তারা জানতে পারেন যে, তাদের পাওয়া খবর মিথ্যা ছিল। পরে তাই তারা এক ব্যক্তির সহায়তায় শহরে প্রবেশ করেন।[৮]

যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালিত পুত্র ও তাঁর আজাদকৃত দাস হলেন যায়েদ বিন হারিসা। বছর ত্রিশেক বয়সে তিনি ইসলাম বরণ করেন। মধ্য আরবে বনু-কালব গোত্রে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। যায়েদ সম্পর্কে বলা হয়, তিনি নবিজির (সাঃ) দশ বছরের ছোট ছিলেন। সাহাবিগণের মাঝে স্পষ্টভাবে একমাত্র তার কথাই কুরআনে এসেছে।[৯]

উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐশী কালামের নূর তনু-মনে মেখে নেন ছাব্বিশ বছর বয়সে। শুরুতে তিনি ইসলামের প্রবল বিরোধিতাকারী ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইসলাম-গ্রহণের জন্য দুয়া করেন। নবিজির দুয়া কবুল হয়। এরপর থেকে তিনি হয়ে যান ইসলামের এক অতন্দ্র প্রহরী। তাঁর কারণে ইসলামের শক্তি আরও মজবুত হয়। প্রায় অর্ধজাহান পর্যন্ত ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে তার খিলাফতকালে।

আর 'আমিরুল মুমিনিন' উপাধিটি সর্বপ্রথম তার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। তাকে বলা হয় 'আল ফারুক' তথা হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী।[১০]

উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম হন। তিনি তৎকালীন সময়ে মক্কার একজন নামকরা ব্যবসায়ী ছিলেন। ৬১১ সালে সিরিয়া থেকে বাণিজ্য করে ফিরে এসে নবিজির ইসলাম প্রচার সম্পর্কে জানতে পারেন এবং আবু বকরের মাধ্যমে তাঁর কাছে গিয়ে ইসলাম বরণ করেন। তিনি 'আস-সাবিকুনাল আওয়ালুনা' তথা প্রথম দিকের ইসলাম-গ্রহণকারীদের একজন ও 'আশারা মুবাশশারা'র অন্তর্ভুক্ত সাহাবি। তখনকার সময়ে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন। তার বড় বড় ব্যবসায়িক কারবার ছিল। ইসলামের জন্য তিনি প্রচুর পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেন। তিনি পরপর রাসুলের দুই মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন; এজন্য তাকে 'যুননুরাইন' বা দুই নূরের অধিকারী বলা হয়। তিনি ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে বলেন, 'আমার যদি আরো মেয়ে থাকতো আমি তাকে উসমানের সাথে বিয়ে দিতাম।' উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত লজ্জাশীল ব্যক্তি ছিলেন।[১১]

সুহাইব ইবন সিনান রাদিয়াল্লাহু আনহু

সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু মাত্র উনিশ বছর বয়সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির আনুমানিক বিশ বছর আগে পারস্য সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর বাবা সিনান ইবন মালিক বসরার এক প্রাচীন শহর উবুল্লার শাসক ছিলেন। সুহাইব ছিলেন বাবার প্রিয়তম সন্তান। তাঁর মা সুহাইবকে সঙ্গে করে আরো কিছু লোক-লস্করসহ একবার ইরাকের সানিয়্যা নামক পল্লীতে বেড়াতে যান। হঠাৎ একরাতে রোমানবাহিনী অতর্কিতে পল্লীটির উপর আক্রমন করে ব্যাপক হত্যা ও লুটতরাজ চালায়। নারী ও শিশুদের বন্দী করে দাস-দাসীতে পরিণত করে। বন্দীদের মধ্যে শিশু সুহাইবও ছিলেন। তখন তাঁর বয়স পাঁচ বছরের বেশি হবে না।

সুহাইবকে রোমের এক দাস-দাসী কেনাবেচার বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দেয়া হয়। তিনি এক মনিবের হাত থেকে অন্য মনিবের হাতে বদলি হতে লাগলেন ক্রমাগতভাবে। তখনকার রোমান সমাজে দাসদের কপালে সচরাচর এমনটাই ঘটতো। এভাবে ভেতর থেকেই রোমান সমাজের গভীরে প্রবেশ করার এবং সেই সমাজের অভ্যন্তরে সংঘটিত অশ্লীলতা ও পাপাচার একেবারে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান সুহাইব।

সুহাইব রোমের ভূমিতে লালিত-পালিত হয়ে একটা সময় যৌবনে পদার্পন করেন। তিনি আরবি ভাষা ভুলে যান অথবা ভুলে যাওয়ার কাছাকাছি পৌঁছেন। তবে তিনি যে মরু আরবের সন্তান, এ কথাটি একটি দিনের জন্যও ভুলেননি। সর্বদা তিনি প্রহর গুনতেন, কবে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবেন, আরবে নিজ গোত্রের সাথে মিলিত হবেন। তাঁর এ আগ্রহ প্রবলতর হয়ে ওঠে যেদিন সুহাইব এক খৃষ্টান কাহিনের (ভবিষ্যদ্বক্তা) মুখে শুনতে পেলেন—'সে সময় সমাগত যখন জাযিরাতুল আরবের মক্কায় একজন নবি আবির্ভূত হবেন। তিনি ইসা ইবন মরিয়মের রিসালাতকে সত্যায়িত করবেন এবং মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসবেন।'

সুহাইব কেবল একটি সুযোগের অধীর প্রতিক্ষায় থাকলেন। একসময় সেই সুযোগ এসেও গেল। মনিবের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে একদিন মক্কায় চলে এলেন। মক্কার লোকেরা তাঁর সোনালি চুল ও জিহ্বার জড়তার কারণে তাকে সুহাইব আর রুমী বলে ডাকতে থাকে। মক্কায় তিনি বিশিষ্ট কুরাইশ নেতা আবদুল্লাহ ইবন জুদআনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তার সাথে যৌথভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন। ব্যবসায় তিনি অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেন। তবে অন্য একটি বর্ণনা মতে, আরবের বনি কালব তাঁকে খরিদ করে মক্কায় নিয়ে আসে। আবদুল্লাহ ইবন জুদআন তাদের নিকট থেকে তাঁকে খরিদ করে আজাদ করে দেন।

সুহাইব মক্কায় তাঁর কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও এক মুহূর্তের জন্যও কিন্তু সেই খৃষ্টান কাহিনের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা ভুলেননি। সে কথা স্মরণ হলেই মনে মনে বলতেন, 'তা কবে হবে?' এভাবে অবশ্য তাকে বেশিদিন কাটাতে হয়নি।

একদিন তিনি এক সফর থেকে ফিরে এসে শুনতে পেলেন, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ নবুয়াত লাভ করেছেন। মানুষকে তিনি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন, তাদেরকে আদল ও ইহসানের প্রতি উৎসাহিত করছেন এবং অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। সুহাইব মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, 'যাঁকে আল আমিন বলা হয় ইনিই কি সেই ব্যক্তি?' লোকেরা বললো, 'হ্যাঁ।' তিনি আরও জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি থাকেন কোথায়?' উত্তরে বলা হলো, 'সাফা পাহাড়ের কাছে আল-আরকাম ইবন আবিল আরকামের বাড়িতে তিনি থাকেন। তবে সতর্ক থেকো কুরাইশদের কেউ যেন তোমাকে তাঁর কাছে দেখে না ফেলে। যদি তারা মুহাম্মাদের কাছে তোমাকে দেখতে পায়, তবে তোমার সাথে তেমন আচরণই তারা করবে যেমনটি তারা আমাদের সাথে করে থাকে। তাছাড়া তুমি একজন ভিনদেশি মানুষ, তোমাকে রক্ষা করার কেউ এখানে নেই। তোমার কোনো গোত্র-গোষ্ঠীও এখানে নেই।'

সুহাইব দারুল আরকামের দিকে অত্যন্ত সন্তর্পণে যেতে লাগলেন। আরকামের বাড়ির দরজায় পৌঁছে দেখতে পেলেন, সেখানে আম্মার ইবন ইয়াসির দাঁড়িয়ে আছেন। আগেই তার সাথে পরিচয় ছিল। একটু ইতস্তত করে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আম্মার! তুমি এখানে?' আম্মার উলটো জিজ্ঞেস করলেন, 'বরং তুমিই বলো, কি জন্য এখানে এসেছ?' সুহাইব বললেন, 'আমি এই লোকটির কাছে যেতে চাই, তাঁর কিছু কথা শুনতে চাই।'

আম্মার বললেন, 'আরে, আমারও তো তাই উদ্দেশ্য!' সুহাইব বললেন, 'চলো তাহলে, আল্লাহর নাম নিয়ে আমরা ঢুকে পড়ি।'

দুজনে এক সাথে নবিজির কাছে পৌঁছে তাঁর কথা শুনলেন। কথপোকথনের একপর্যায়ে তাঁদের অন্তর ইমানের নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। দুজনেই এক সাথে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কালেমা শাহাদাত পাঠ করলেন। ঐ গোটা দিনটিই তাঁরা নবিজির সাহর্চযে থেকে তাঁর উপদেশপূর্ণ বাণী শ্রবণ করলেন। গভীর রাতে মানুষের শোরগোল স্তিমিত হয়ে এলে, তারা চুপে চুপে অন্ধকারে রাসুলুল্লাহর কাছ থেকে বেরিয়ে নিজ নিজ আস্তানার দিকে বেরিয়ে পড়লেন।

সুহাইবের আগে ত্রিশেরও অধিক সাহাবি ইসলাম-বরণ করেছিলেন। তাঁদের অধিকাংশরা কুরাইশদের ভয়ে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখেছিলেন। সুহাইব যদিও বিদেশি ছিলেন, মক্কায় তাঁর কোন আত্মীয়-বন্ধু ছিল না, তা সত্ত্বেও তিনি তার ইসলাম-গ্রহণের কথা গোপন রাখলেন না। প্রকাশ্যে মুসলিম হবার কথা ঘোষণা করে দিলেন তিনি। অতঃপর যথারীতি তিনিও বিলাল, আম্মার, সুমাইয়া ও খাব্বাব প্রমুখের ন্যায় কুরাইশদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের শিকারে পরিণত হলেন। তবে তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সকল নির্যাতন সহ্য করতে থাকেন। কেননা সুহাইব জানতেন, জান্নাতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরতের সংকল্প করলেন, সুহাইব তা অবগত হলেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনিই হবেন 'সালিসু সালাসা' তথা 'তিনজনের তৃতীয় জন।' অর্থাৎ নবিজি, আবু বকর ও সুহাইব। কিন্তু কুরাইশদের জোরদার পাহারার কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। কুরাইশরা তার পিছু লেগেছিল, যাতে তিনি তার বিপুল ধন-সম্পদ নিয়ে মক্কা থেকে সরে যেতে না পারেন।

নবিজির হিজরতের পর সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন। ওদিকে কুরাইশরাও তাকে চোখের আড়াল হতে দেয় না। অবশেষে তিনি এক কৌশলের আশ্রয় নিলেন। প্রচণ্ড এক শীতের রাতে ঘনঘন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাড়ির বাইরে যেতে লাগলেন। একবার গিয়ে আসতে না আসতেই আবার যেতে লাগলেন। কুরাইশ পাহারাদাররা বলাবলি করলো, লাত ও উযযা তার পেট খারাপ করে দিয়েছে! তারা বেশ কিছুটা আত্মতৃপ্তিবোধ করলো এবং বাড়িতে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো। এই সুযোগে সুহাইব বাড়ি থেকে বের হয়ে মদিনার পথ ধরলেন।

সুহাইব মক্কা থেকে বেরিয়ে কিছু দূর যেতে না যেতেই পাহারাদাররা কীভাবে যেন বিষয়টি জেনে ফেলে। জলদি তারা দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তার পিছু ধাওয়া করে। সুহাইব তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে একটি উঁচু টিলার উপর উঠে তীর-ধনুক বের করে তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা জানো আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তীরন্দাজ ও নিশানাবাজ

ব্যক্তি। আল্লাহর কসম, আমার কাছে যতগুলি তীর আছে, তার প্রত্যেকটি দিয়ে তোমাদের এক-একজন করে খতম না করা অব্দি আমার কাছে তোমার পৌঁছুতে পারবে না। তারপর আমার তরবারি তো আছেই।'

কুরাইশদের একজন বললো, 'আল্লাহর কসম! তোমার জীবনও বাঁচবে না এবং তোমার অর্থকড়ি তুমি নিয়ে যাবে তা আমরা হতে দেব না। তুমি মক্কায় এসেছিলে শূন্য হাতে। এখানে এসেই এসব ধন-সম্পদের মালিক হয়েছো।'

সুহাইব বললেন, 'আমি যদি আমার ধন-সম্পদ তোমাদের হাতে তুলে দিই, তাহলে কি তোমরা আমার রাস্তা ছেড়ে দেবে?' তারা বললো, 'হ্যাঁ।' সুহাইব তখন তাদেরকে সাথে করে মক্কায় তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং তার ধন-সম্পদ তাদের হাতে তুলে দিলেন। কথামতো কুরাইশরাও তার পথ ছেড়ে দিল। এভাবে সুহাইব দ্বীনের তরে সবকিছু ত্যাগ করে রিক্তহস্তে মদিনায় চলে এলেন। পেছনে ফেলে আসা কষ্টার্জিত ধন-সম্পদের জন্য তিনি একটুও কাতর হননি। পথে যখনই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, নবিজির সাথে সাক্ষাতের কথা স্মরণ হতেই সব ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে আবার যাত্রা শুরু করতেন। এভাবেই একসময় তিনি কুবায় পৌঁছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কুবায় কুলসুম ইবন হিদামের বাড়িতে। নবিজি তাকে আসতে দেখে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠেন, 'আবু ইয়াহইয়ার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে।' পরপর তিনবার তিনি একথাটি বলেন। সুহাইবের মুখাবয়াব আনন্দে আলোময় হয়ে ওঠে। সুহাইব তখন বলে উঠেন, 'আল্লাহর কসম, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমার আগে তো আপনার কাছে কেউ আসেনি। নিশ্চয় জিবরিল এ খবর আপনাকে দিয়েছে।' সত্যিই, সুহাইবের ব্যবসাটি লাভজনকই হয়েছিল। একথার সমর্থণে জিবরিল আলাইহিস সালাম ওহি নিয়ে হাজির হলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌۢ بِالْعِبَادِ

"কিছু মানুষ এমনও আছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবনও বিক্রি করে দেয়। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।"[১২]

সুহাইব মদিনায় সা'দ ইবন খুসাইমার অতিথি হন এবং হারিস ইবনুস সাম্মা আল-আনসারির সাথে তার ভ্রাতৃ-সম্পর্ক কায়েম হয়।

সুহাইব সম্পর্কে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অত্যন্ত সুধারণা ছিল। তিনি তাকে ভীষণ ভালবাসতেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অসিয়ত করে যান—সুহাইব তার জানাযার ইমামতি করবেন। শুরার সদস্যবৃন্দ যতক্ষণ নতুন খলিফার নাম ঘোষণা না করবেন, তিনিই খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে থাকবেন। উমরের মৃত্যুর পর তিন দিন পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে খলিফার দায়িত্ব পালন করেন সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু।

সুহাইব ছিলেন ভীষণ অতিথিপরায়ণ ও দানশীল। গরিব-দুঃখীর প্রতি ছিলেন দরাজহস্ত। প্রায়ই মানুষের ধারণা হত—তিনি বুঝি দারুণ অমিতব্যয়ী। একবার উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, 'তোমার কথা আমার ভালো লাগে না। কারণ প্রথমত, তোমার কুনিয়াত আবু ইয়াহইয়া। এই (ইয়াহইয়া) নামে একজন নবি ছিলেন। আর এ নামে তোমার কোন সন্তানও নেই। দ্বিতীয়ত, তুমি বড় অমিতব্যয়ী। তৃতীয়ত, তুমি নিজেকে একজন আরব বলে দাবি কর।' জবাবে সুহাইব বলেন, 'প্রথমত, এই কুনিয়াত আমি নিজে গ্রহণ করিনি। নবিজির মনোনীত। দ্বিতীয়ত, অমিতব্যয়িতা তাই তো। তা আমার একাজের ভিত্তি হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী—যারা মানুষকে অন্নদান করে এবং সালামের জবাব দেয় তারাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। তৃতীয় অভিযোগটির জবাব হলো, প্রকৃতই আমি একজন আরব সন্তান। শৈশবে রোমবাসী আমাকে লুট করে নিয়ে আমার গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাসে পরিণত করে। এ–কারণে আমি আমার গোত্র ও খান্দানকে ভুলে যাই।'[১৩]

তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু

তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু মাত্র সতেরো বছর বয়সে মুসলিম হন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাম রাখেন তালহাতুল খায়র। তিনিও প্রথম ইসলাম বরণকারী আটজন ব্যক্তির অন্যতম।

তিনি একবার ব্যবসা করতে সিরিয়া যান। সেখানে বাজারের মধ্যে এক খ্রিষ্টান ধর্মযাজক তাঁকে আরবের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। ধর্মযাজকের মুখে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনে তালহা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। পরে মক্কায় ফিরে তিনি জানতে পারেন আবু বকর নবি মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তাই বিস্তারিত জানতে তিনি আবু বকরের বাড়িতে যান। আবু বকরের কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে তিনি ভীষণ মুগ্ধ হয়ে যান এবং অবশেষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু বকরের হাতে ইসলাম-গ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থতম। [১৪]

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু মাত্র ষোল বছর বয়সে ইসলামের ছায়াতলে আসেন। তিনি ছিলেন সম্পর্কে নবিজির ফুফাতো ভাই। তিনি আশারা মুবাশশারার দশজন সাহাবির একজন। নবিজি তাঁর ব্যাপারে বলতেন, 'প্রত্যেক নবিরই হাওয়ারি মানে শিষ্য আছে, আর আমার হাওয়ারি হল যুবাইর। আর হাসান-হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হলেন জান্নাতবাসী যুবকদের নেতা।' [১৫]

আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু

আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু মাত্র এগারো বছর বয়সে ইসলাম বরণ করেন। মুসলিম মনীষীদের তালিকায় আরকাম এক সমুজ্জ্বল তারকার নাম। [১৬]

ইসলামের তরে মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর গৃহবন্দিত্ব

মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে মক্কার সবচেয়ে বেশি নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। তাঁর মতো দামি দামি কাপড় পরিধানকারী এবং উত্তম সুগন্ধি ব্যবহারকারী মক্কায় দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। তিনি যে পথ দিয়ে যেতেন সে পথ দিয়ে কেউ গেলে তাঁর সুগন্ধির সুরভীর দরুন মানুষ বলে দিতে পারত যে, এখান দিয়ে মুসআব বিন উমাইর যাতায়াত করেছে।

আল্লাহ তাআলা যখন তার বক্ষকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন তখনই তিনি এ শাশ্বত বিধানের সামনে নিজেকে পুরোপুরিভাবে সঁপে দেন। ইসলাম-গ্রহণের ব্যাপারটি তাঁর মা-সহ গোত্রীয় লোকদের থেকে গোপন রাখেন। পরবর্তীতে তাঁর মুসলিম হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পেয়ে গেলে গোত্রের লোকেরা তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখে। কিন্তু আল্লাহর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহে একসময় তিনি সেই বন্দিত্ব হতে পলায়ন করে আবিসিনিয়ায় প্রথমবারে মতো হিজরত করেন। অতঃপর অন্যান্য মুসলিমরা ফিরলে তিনিও তাদের সাথে ফিরে আসেন। কিন্তু সেখানে সামান্য কালবিলম্ব না করে দ্বীন ও ইমান হিফাজত করনার্থে পুনরায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। পরবর্তীতে যখন ফিরে আসেন তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দাওয়াতি কাজের জন্য প্রথমবারের মতো দূত হিসেবে মনোনীত করেন। প্রথম আকাবায় যারা বাইআত গ্রহণ করেছিল তাদেরকে দ্বীন শেখানোর জন্য নবিজি তাঁকে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। ধীরে ধীরে তিনি মদিনার লোকদের মাঝে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতে থাকেন। তাঁর হাতে অনেকেই মুসলিম হয়। যাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন – আমর ইবনুল জামুহ এবং আনসার সরদারদের মাঝে উসায়দ ইবনুল খুদাইর, সা'দ বিন মুআজ ও সা'দ বিন উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম। আর এসকল নেতাদের ইসলাম বরণের কারণেই তাদের স্ব-স্ব গোত্র (আউস ও খাজরাজ) ইসলাম গ্রহণ করে। এমনকি আল্লাহর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহে আনসারদের অধিকাংশ বাড়িতে ইসলামের নূর প্রবেশ করে। এই যুবক দাঈ, ইসলামের প্রথম দূত মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও মেহনতের বদৌলতেই কেবল উপর্যুক্ত ঘটনাবলি সম্ভবপর হয়।[১৭]

আলি ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক অসাধারণ আত্মত্যাগ

মুসলিম উম্মাহর চিন্তায় যেসব যুবক সর্বদা চিন্তিত ছিলেন, তাদের মাঝে অন্যতম হলেন আলি ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের সময় আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু নবিজির শয়নস্থলে শুয়ে থাকেন। যখন কিনা তাঁর বয়স ছিল মাত্র তেরো বছর। কেননা তিনি জানতেন যে, কাফেরদের উদ্দেশ্য রাসুলকে হত্যা করা। তাই তিনি শত্রুদের দূরভিসন্ধী বুঝতে পেরে অভূতপূর্ব এক কৌশলে তাদেরকে ধোঁকা দেন। এদিকে নবিজিও মুক্তি পান

এবং গোপনে মদিনার পথে এগিয়ে যান। বস্তুত, তারাই ছিলেন নবির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্য আত্মোৎসর্গকারী।[১৮]

আসমা বিনত আবু বকর ও আবদুল্লাহ ইবন আবু বকরের রাসুলের প্রতি এক অনুপম ভালবাসার দৃষ্টান্ত

হিজরতকালীন আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সিদ্দিকে আকবারের জন্য খাবার তৈরি করতেন এবং তাঁর ভাই আবদুল্লাহ সেই খাবার নিয়ে যেতেন। পাশাপাশি তিনি প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহও করতেন তাঁদের কাছে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আজাদকৃত গোলাম আমির বিন আবি ফুহায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাগল এনে আবদুল্লাহর পেছনে ছেড়ে দিতেন। সেই ছাগল তার পেছন পেছন একেবারে গুহা অব্দি চলে যেত। অতঃপর নবিজি ও সিদ্দিকে আকবার ঐ ছাগলের দুধ পান করতেন।[১৯]

সুবহানআল্লাহ! দয়াময় রব তাঁদের সকলের প্রতি রাজি-খুশি থাকুন। আমিন।

তথ্যসূত্র: ১। সুরা আল আম্বিয়া, আয়াতঃ ৬০

২। সূরা আস-সাফফাত, আয়াতঃ ১০০-১১১

৩। সূরা ইউনুস, আয়াত: ৮৩

৪। সূরা আল কাহফ, আয়াত: ১৩

৫। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড

৬। আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ড মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, ১ম খন্ড।

৭। আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ড মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, ১ম খন্ড।

৮। আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ড মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, ১ম খন্ড।

৯। আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ড মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, ১ম খন্ড।

১০। আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ড মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, ১ম খন্ড।

১১। আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ড মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, ১ম খন্ড।

১২। সুরা আল বাকারা, আয়াত: ২০৭

১৩। আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ড মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, ১ম খন্ড, ১৫-১৮ পৃষ্ঠা

১৪। আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ড মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, ১ম খন্ড, ৬৪-৭০ পৃষ্ঠা

১৫। আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ড মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, ১ম খন্ড, ৫৭-৬২ পৃষ্ঠা

১৬। আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ড মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, ১ম খন্ড, ১৪৭-১৪৯ পৃষ্ঠা

১৭। আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ড মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, ১ম খন্ড, ২১৪-২১৯ পৃষ্ঠা

১৮। আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ড মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, ১ম খন্ড, ৪৭-৫৬ পৃষ্ঠা

১৯। আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ড মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১১৭-১১৮ পৃষ্ঠা

৪

ইলমের প্রচার-প্রসারে যুবকদের আত্মত্যাগ

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে ইলম দান করেন কেবল নওজোয়ান অবস্থায়। আর কল্যাণের পুরোটা রয়েছে যৌবনকালেই।' এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন এই আয়াতগুলো—

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُۥٓ إِبْرَٰهِيمُ

লোকেরা বলল, 'আমরা এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি; তাকে বলা হয় ইবরাহিম।'(১)

نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَٰهُمْ هُدًى

নিশ্চয় তারা (আসহাবুল কাহাফ) ছিল একদল যুবক যারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল। আর আমি তাদের হিদায়াতকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।(২)

وَءَاتَيْنَٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

"আর আমি তাকে (ঈসাকে) শৈশবেই প্রজ্ঞা দান করেছিলাম।"(৩)

সুতরাং এযাবৎ আলোচনা হতে প্রতীয়মান যে—যারা ইলম-আমলের ধারক-বাহক হয়ে সমগ্র উম্মাহর মাঝে তা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রচার-প্রসার করেছে, বই-পত্তর লিখেছে, তাদের সিংহভাগই ছিল যুবক। এবার তাহলে এরকম বেশ কিছু যুবকের নমুনা দেখা যাক।

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু

প্রাণপ্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর সময় ইবন আব্বাসের বয়স ছিল সবে তেরো বছর। এত অল্প বয়সেও তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রচুর পরিমাণ ইলম অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন কুরআনের তাফসীরকারী। তাকে বলা হয় 'রঈসুল মুফাসসিরিন' বা তাফসীরকারগণের নেতা।

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ব্যাপারে বলেন, 'ইবন আব্বাস কতইনা উত্তম কুরআনের ব্যাখ্যাকারী!' তাঁর সঙ্গী-সাথিরা তাকে পণ্ডিত বলে সম্বোধন করতেন।

ইবন আব্বাস নবিজির হাদিসসমূহ খুঁজে বেড়াতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তির ব্যাপারে আমার কাছে সংবাদ পৌঁছত যে, তার কাছে রাসুলের হাদিস আছে, তাহলে আমি তার দরজায় গিয়ে উপস্থিত হতাম। এরপর তাকে দুপরের কাইলুলা তথা বিশ্রামরত অবস্থায় পেলে আমি আমার চাদরকে বালিশ বানিয়ে তার দরজার সামনেই সটান শুয়ে পড়তাম। বাতাস আমার উপর ধুলোবালি স্তূপ আছড়ে ফেলত। অতঃপর যখন সে বের হয়ে আমাকে দেখত তখন বলতো, 'হে রাসুলের চাচাতো ভাই! কোন জিনিস আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে? আপনি কেন আমাকে ডেকে পাঠালেন না! আমি তো নিজেই আপনার কাছে চলে যেতাম।' এ কথা শুনে আমি বলতাম—'আমিই আপনার কাছে আসার অধিক উপযুক্ত।' অবশেষে তাকে হাদিসটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতাম।

তিনি কুরআন, হাদিস, তাফসির ও কবিতা এবং বিভিন্ন ভাষাসহ আরো বহু বিষয়ে ইলম অর্জন করেছিলেন। অবশ্য এতসব কিছু হওয়ার নেপথ্যে কারণ ছিল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুয়ার বরকত। এ ব্যাপারে একটি হাদিস বর্ণিত আছে,

> ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল খালায় প্রবেশ করলেন। আমি তাঁর জন্য অজুর পানি

> রেখে দিলাম। তিনি (বায়তুল খালা হতে বেরিয়ে এসে) বললেন, 'কে রেখেছে এটি?' অতঃপর তাঁকে সংবাদ দেয়া হলে তিনি বলেন, 'আল্লাহুম্মা ফাক্কিহু ফিদ্দীন" (হে আল্লাহ, আপনি তাকে দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান দান করুন।)" (৪)

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে অন্য আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যাতে তিনি বলেন,

> আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর মুখোমুখি করে বললেন, 'হে আল্লাহ, তাকে তুমি প্রজ্ঞা শিক্ষা দাও এবং কিতাবের ব্যাখ্যা শিক্ষা দাও।'(৫) (৬)

মুআজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু

মুআজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম হন মাত্র আঠারো বছর বয়সে। খোদ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যাপারে সাক্ষ্য দেন যে, 'কিয়ামতের দিন তিনি (মুআজ) আলিমগণকে পেছনে ফেলে সবার সামনে এগিয়ে যাবেন।' তিনি মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ অবশ্য বলেন আরও কম, আঠাশ বছর বয়সে। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ দ্বিতীয় মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহও তার সাথে একমত পোষণ করেন। হিসেব করলে, তার ইলম অর্জনের সময়সীমা দশ বছরও অতিক্রান্ত হয়নি। এতদসত্ত্বেও তিনি 'ইমামুল উলামা' তথা 'সকল আলিমের সর্দার।'

তাঁর সম্পর্কে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'তোমাদের মাঝে হালাল-হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী হল মুআজ বিন জাবাল।'

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর অপর একটি বর্ণনা আনেন, যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> 'মুআজ বিন জাবাল মানুষের মাঝে হালাল-হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি প্রাজ্ঞ।' (০৭)

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাষ্যমতে, মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু নবিজির আমলে পুরো কুরআন একত্রিত করেন।

নবিজি ইয়েমেনের লোকদের ইসলাম শেখানোর জন্য মুআজকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফার দায়িত্ব পালন করছিলেন।[৮]

আমর বিন সালামাহ আল জুরমি রাদিয়াল্লাহু আনহু

আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছোটাবস্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পান এবং ঐ সময়েই ইসলাম বরণ করেন। তিনি রাসুলের জামানায় স্বীয় গোত্রের নামাজের ইমামতি করতেন। কারণ তিনি সবার চেয়ে বেশি কুরআন হিফজকারী ছিলেন। অথচ তখন তাঁর বয়স ছিল সবে ছয় কি সাত বছর!

ইয়াহইয়া ইবন রাবাহ বলেন, আমি আমর বিন সালামাহকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, 'আমি আমার বাবার সাথে আমার কওমের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ নিয়ে নবিজির কাছে গেলাম। তিনি আমাদেরকে আমার কওমের ব্যাপারে আদেশ দেন যে, 'তোমাদের মাঝে যে বেশি কুরআন পারে, সে যেন তোমাদের নামাজের ইমামতি করে।' আর তাদের মাঝে আমিই বেশি কুরআন পারতাম। তাই আমার গোত্র আমাকে ইমামতির জন্য এগিয়ে দেয়।'

জনৈক কবি বলেন,

যুবক যারা বিজয় পতাকা উচ্চ করে শিখরে;
দ্বীনকে ফেলে অন্যকিছুর নেয় না তারা পিছুরে।
জিহাদের মাঠে ঢাল হয়ে তারা ভাঙ্গে পাহাড় আর দূর্গ,
রাতের গভীরে বিনয় বদনে সিজদায় খোঁজে স্বর্গ!

ইলমের সমুদ্দুর আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু

আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন খাদিম। তিনি নবিজির সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে অত্যাধিক পরিমাণে ইলম আহরণ করেন। একটি হাদিসে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, '

'নবিজি মদিনায় আসার সময় আমি ছিলাম দশ বছরের বালক। আর যখন তিনি ইন্তেকাল করেন তখন আমার বয়স ছিল কুড়ি বছর।'[৯]

যায়দ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু

যায়দ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একাধারে ওহি লেখক, কুরআন সংকলক এবং হাফিজ। মাত্র এগারো বছর বয়সে তিনি মুসলিম হন।

> একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয় যে, যায়দ আপনার উপর অবতীর্ণ সতেরোটি সুরা মুখস্থ করে ফেলেছে। যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই বলেন, 'এরপর আমি নবিজিকে সুরাগুলি পাঠ করে শুনালাম। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন – 'হে যায়দ! তুমি আমার জন্য ইয়াহুদিদের কিতাব শিক্ষা করো।'

অন্য বর্ণনায় আছে, যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, '

> 'আমি মাত্র পনেরো দিনে তা শিখে ফেললাম! আর আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে চিঠি লিখতাম যখন তিনি তাদের (ইয়াহুদিদের) কাছে চিঠি পাঠাতেন।'[১০]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়দের মাঝে অজস্র সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যায়দের মধ্যে রয়েছে—সৌকর্য, হিফজের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও নিপুণতা, লেখালেখির যোগ্যতা, কথাবার্তায় আমানতদারিতা এবং নুসুসসমূহ বোঝার ক্ষেত্রে পরিপক্কতা। এতসব গুণের দরুন যায়দকে তিনি

এক মহান দায়িত্ব অর্পণ করেন। আর তা হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ ওহির লিপিবদ্ধকরণ। এ দায়িত্বখানি যায়দের জন্য অত্যন্ত ভারী ও বিশাল মর্যাদার বিষয় ছিল।

যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মান-মর্যাদা ঠিক কেমন ছিল তার কিছু ঝলক এবার একটু দেখে নেয়া যাক—

নবিজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাতের পর আনসার ও মুহাজিরগণ সকিফা বনি সায়েদা (আনসারদের বৈঠকখানা)-এর মাঝে সমবেত হন। মূলত খলিফা নিযুক্ত করা নিয়ে এই পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আনসারদের মাঝে বক্তাগণ ভাষণ দেন। তারা বলেন, 'খলিফা হবে তোমাদের মাঝে একজন ও আমাদের মাঝে একজন।' অতঃপর যায়দ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে যান। তিনি বলেন, 'নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত। আর আমরা ছিলাম তার আনসার বা সাহায্যকারী। আর ইমামও হবেন মুহাজিরদের থেকেই। আমরা হব সেই ইমামের আনসার।' একথা শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন –

'তোমাদেরকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন হে আনসার সম্প্রদায়! আর তোমাদের এ বক্তাকে দৃঢ়পদ করুন। যদি তোমরা এটা ছাড়া অন্যকিছু বলতে তাহলে আমরা সন্ধি করতাম না।'[১১]

এভাবেই যায়দ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু দোলনাতে থাকা অবস্থাতেই ফিতনাকে মাটি চাপা দেন।

রিদ্দার যুদ্ধের সময় বহুসংখ্যক কুরআনের হাফিজ শাহাদাত বরণ করেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যায়দ বিন সাবিতকে বলেন,

'নিশ্চয় আপনি মতিমান যুবক। আপনি আল্লাহর রাসুলের সময় ওহি লিপিবদ্ধ করেছেন। কুরআনের আয়াতগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁজেখুঁজে একত্রিত করেছেন।'

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যায়দ বিন সাবিতকে কুরআন সংকলনের নির্দেশ দেন। কথামতো, যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআন সংকলন শুরু থেকে শেষ করেন। সংকলিত সেই নুসখাগুলো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছেই ছিল। পরবর্তীতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর পর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে সংরক্ষিত থাকে এবং সবশেষে হস্তান্তর হয় হাফসা বিনতু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে।

কিন্তু যখন মানুষের মাঝে কুরআন তিলাওয়াতের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যায়দকে সেই নুসখায় কুরআনের পুনরায় সংকলন করার নির্দেশ দেন যেই নুসখার তিলাওয়াত কুরাইশদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। আদেশমতো যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাই করেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ লিখিত নুসখার অনুলিপিগুলো ইসলামি খিলাফার অধীন সকল অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন এবং ঐ রীতির নুসখা ছাড়া বাকি সকল নুসখা জ্বালিয়ে দেয়ার আদেশ দেন। পরবর্তীতে তাই করা হয়।[১২]

যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবিদের মাঝে ফারায়িজ সম্পর্কেও সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। এ ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার উম্মতের মাঝে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত জ্ঞানের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞ হল যায়দ বিন সাবিত।'

ইমাম শাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কাজি হলেন চারজন—উমর, আলি, যায়দ বিন সাবিত ও ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম।'[১৩]

মাসরুক রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

'রাসুলের সাহাবিদের মাঝে যারা ফতোয়া দিতেন তারা হলেন—উমর, আলি, ইবন মাসউদ, যায়দ, উবাই এবং আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহুম।' [১৪]

নবিজির সাহাবিরা ইলমের যথাযথ কদর করতেন, মুহাব্বত করতেন ও ইলম ওয়ালাদেরও উপযুক্ত মর্যাদা দিতেন। এইদিকে খেয়াল করেই আবদুল্লাহ ইবন

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, যায়দ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর উটের লাগাম ধরে নিয়ে যেতেন। তখন যায়দ বলতেন, 'হে নবিজির চাচাতো ভাই, আপনি সরুন!' তখনই ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, 'নিশ্চয় আমাদের বড় বড় উলামাদের সাথে, আকাবিরদের সাথে এমনই ব্যবহার করব।'[১৪]

৬৬০ সালে যায়দ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুবরণ করেন। তখন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'এই উম্মাহর পণ্ডিত মারা গেল। আল্লাহ তাআলা ইবন আব্বাসকে হয়ত তাঁর প্রতিনিধি বানাবেন।'[১৫]

রবিয়া বিন আবি আবদির রাহমান রাহিমাহুল্লাহ

পুরো নাম রবিয়া বিন আবি আবদির রহমান ফারুখ। তবে রবিয়া নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। কমবয়সী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একাধারে মদিনার মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুজতাহিদ ও তাদের ঈমাম। আর তার দারসে অংশগ্রহণ করেছেন— ঈমাম মালিক, ঈমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান আস সাওরি, ঈমাম আওযায়ি এবং লায়স বিন সাদি প্রমূখ বড় বড় আলিমগণ, যারা কিনা একেকজন ছিলেন ইসলামি ইতিহাসে উজ্জ্বল তারকাতূল্য।

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ নিজের ব্যাপারে বলেন, 'আমাকে আমার আম্মি সুন্দর সুন্দর কাপড় পরিয়ে দিতেন ও সাদা পাগড়ি বেঁধে দিতেন। এরপর জামার আস্তিনে স্বর্ণের একটি টুকরো দিয়ে বলতেন, 'যাও, মসজিদে যাও। আর হ্যাঁ, মজলিসের প্রধান না হয়ে আমার কাছে ফিরবে না।' পরবর্তীতে কিন্তু সত্যিই তাই হয়েছিল।[১৬]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইদরিস আশ-শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ

আশ-শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ গাজায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম সে বছর হয় যে বছর ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন অর্থাৎ ১৫০ হিজরিতে।

অতঃপর একেবারে ছোট অবস্থাতেই তাঁর মা তাকে নিয়ে ইয়েমেনে চলে আসেন এবং পরে সেখান থেকে চলে আসেন মক্কায়। মক্কায় তিনি মসজিদুল হারামের দারসে যেতেন এবং সেই দারসগুলো নোট করে রাখতেন। তিনি এত বেশি নোট করতেন যে, একসময় তাঁর নোট করা খাতায় পুরো ঘর ভরে যায়। একদিন দরজা বন্ধ করে দিয়ে প্রতিজ্ঞার সুরে বলেন, 'ঐ দারসগুলোর নোট তিনি মুখস্থ না করে বের হবেন না।' পরে তিনি একে একে সব নোট মুখস্থ করে ফেলেন।

পরবর্তীতে তাঁর মা তাকে হুজাইল নামক গোত্রে পাঠিয়ে দেন যখন কিনা তাঁর বয়স দশের কোঠাতেও পৌঁছেনি। সেখান থেকে তিনি হাজার বিশেক চরণ মুখস্থ করে ফেলেন। এরপর তিনি মক্কায় ফিরে আসেন এবং প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগেই মুখস্থ করেন ঈমাম মালিকের 'মুয়াত্তা ইমাম মালিক' কিতাবটি। এই গ্রন্থটি ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর কাছে চল্লিশ মজলিসে পাঠ করে শোনান। ২০৪ হিজরিতে এই বিদগ্ধ ঈমাম চুয়ান্ন বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি গোটা দুনিয়ায় জ্ঞান ও পরহেজগারিতে ভরে দিয়েছিলেন।[১৭]

ঈমাম আহমাদ ইবন হানবাল রাহিমাহুল্লাহ

ঈমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ ষোল বছর বয়সেই হাদিস শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন। শৈশবাস্থায় তিনি বাবাহীনা লালিত-পালিত হন। তাঁর মা তাঁকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে যত্ন করে বড় করেন। একসময় গোটা ধরার আনাচে-কানাচে আহমাদ ইবন হানবাল রাহিমাহুল্লাহর ইলমের প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে।[১৮]

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ

মুসলিম উম্মাহর আলিমদের মাঝে অন্যতম একজন হলেন ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ। তিনি প্রসিদ্ধ হাদিসের কিতাবসমূহ যেমন: ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর কিতাব, ইমাম ওয়াকি রাহিমাহুল্লাহর কিতাব পড়ে ফেলেন ষোল বছর বয়সেই। মাত্র আঠারো বছর বয়সে সাহাবা ও তাবিয়িদের বিচার-ফারসালা এবং তাদের উক্তি নিয়ে আস্তমস্ত একটি বই লিখে ফেলেন; নাম 'আত-তারিখুল কাবির'।

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ নিজের ব্যাপারে বলেন যে, 'কুড়ি বছর বয়সে দারসগাহে থাকতেই হাদিস মুখস্থ করার প্রতি আমি ভীষণ অনুপ্রাণিত হই।'

তিনি আরো বলেন, 'আমি এক হাজার সনদসহ সহিহ হাদিস এবং দুই হাজার গায়রে সহিহ হাদিস মুখস্থ করেছি।'

নুআইম বিন হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ ইমাম বুখারির ব্যাপারে বলেন, 'মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল বুখারি হল এই উম্মাহর ফকিহ।'[১৯]

যারা ইলমের ঝাণ্ডাকে উন্নীত করেছেন এবং দ্বীনের খেদমতে নিজেদের জীবন-যৌবন ও সম্পদ অকাতরে ব্যয় করেছেন এমনসব আলিমগণের আলোচনা ক্রমাগতভাবে যদি উপস্থাপন করা হয় এবং তাতে একটা দীর্ঘ সময় নির্বাহ করলেও, তবুও তা যথেষ্ঠ হবে না।

কবি কতই না সুন্দর বলেছেন,

চেষ্টার মাঝেই রয়েছে লোকের প্রাপ্তির অনুপাত;

সম্মান তাঁকে দিয়েছে ধরা, যে জেগেছে বহুত রাত;

মর্যাদার পিছে ছুটছ তবুও দিন কাটে ঘোর ঘুমে,

সাগরতলে মুক্তোর খোঁজ, তুমি যাচ্ছো কোন সে খানে?

আমরা আশাবাদী—আমাদের তরুণ-সমাজ সেই সোনালি প্রজন্মের অনুসরণ করবে, যারা ইলমের প্রচার-প্রসারে ও দ্বীনের কল্যাণে বিরামহীন সময় অতিপাত করেছে। আর তারা তো আঁধারে ঘেরা রজনীর তারার ন্যায়। কিন্তু বড় আফসোস ও পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে আমাদের যুবকেরা তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে—নায়ক, গায়ক ও খেলুড়েদেরকে।

তাই আমাদের আবশ্যক হয়ে পড়েছে যুবকদেরকে সঠিক দীক্ষা ও দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া; তারবিয়াত দান করা। দ্বীনের ব্যাপারে তাদেরকে দৃঢ়পদ করে তোলা এবং তা পালনে পুরোপুরি অভ্যস্ত করে তোলা। তাদেরকে ইলমের অর্জনের জন্য জোর

তাগিদ দেয়া। তাদের চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে ইসলামের সুরক্ষায় ধোঁকাবাজদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করানো আমাদের অত্যাবশ্যক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

হে আমার যুবক ভাই! সমগ্র জাতি আজ তোমারই প্রতীক্ষায় আছে যতক্ষণ না তাদের শেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি বাকি থাকে এবং ফিরে আসে তাদের মান-মর্যাদা।

সুতরাং, আর দেরি নয়। হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে এখুনি লেগে পড়ো।

তথ্যসূত্র:

১। সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত: ৬০
২। সূরা আল কাহফ, আয়াত: ১৩
৩। সূরা মারইয়াম, আয়াত: ১২
৪। বুখারি: ১৪৩, মুসলিম: ২৪৭
৫। ইবন মাজাহ: ১৬৬
৬। আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ড মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, ১ম খন্ড, ১৩১-১৩৯ পৃষ্ঠা
৭। সহিহ আল জামে, হাদিস নং ৫৮৭৯, মুস্তাদরাক লিল হাকিম
৮। আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ড মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, ১ম খন্ড, ৬৭-৭৭ পৃষ্ঠা
৯। সহিহ মুসলিম
১০। আত তারিখুল কাবির লিল ইমাম বুখারি
১১। ঈমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ, আবু সাঈদ হতে বর্ণনা করেন
১২। হাদিসটি বুখারি হতে আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত
১৩। তাহযিব-ইবনু আসাকির, ৫/৪৫০
১৪। ইবনু সাদ, হাকিম এটিকে সহিহ বলেছেন
১৫। আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ড মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, ৪র্থ খন্ড, ৭০-৯৩ পৃষ্ঠা
১৬। Imam Malik-His Dedication in Compilation of Hadith Book Moatta an Outlook from Historical Review, Aziz-Ur-Rehman Saifee, Karachi, Pakistan
১৭। Short biography of Imam Al-Shafi'ee, https://www.islamicfinder.org/knowledge/biography/story-of-imam-alshafiee/
১৮। Short Biography of Imam Ahmad Bin Hanbal https://www.islamicfinder.org/knowledge/biography/story-of-imam-ahmad-bin-hanbal/
১৯। Short Biography of Imam Bukhari https://www.islamicfinder.org/knowledge/biography/story-of-imam-bukhari/

৫

হারানো নেতৃত্ব ও শাসন ফেরানো

মুসলিম উম্মাহ বহুপ্রাচীন একটি উম্মাহ। সৃষ্টিলগ্নের শুরু থেকেই তাদের হাতে ছিল শাসন ও নেতৃত্ব। যুবকদের দ্বারা সেই মান-মর্যাদা আরো উঁচু হয়, উন্নতির শিখরে পৌঁছে। জাতির যুবকেরাই এই শাসনকার্যকে আরো বিস্তৃত করেছিল; তারাই মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল জীবনের প্রতিটি স্তরে—সে সোনালি অধ্যায় আমরা অতিক্রম করে এসেছি। সুতরাং তারাই হল ঐসব যুবক যারা জিহাদের ঝাণ্ডাকে উন্নীত করেছে এবং ইলম ও দাওয়াহ ইলাল্লাহয় ব্যয় করেছে নিজেদের জীবন। তাদের দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছিল দুনিয়ার পূর্ব হতে পশ্চিম দিগন্তে। দাওয়াত ও জিহাদের ধারাবাহিকতায় তাদের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে রাজ্যের পর রাজ্য। দলে দলে লোকজন বরণ করেছে তাদের দ্বীন ইসলাম।

সুতরাং বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ যে অসম্মান ও লাঞ্ছনার সাথে দিনাতিপাত করছে এবং পরাধীনতার বেড়ি পরে আছে তার মূল কারণ হচ্ছে—যুবকেরা আল্লাহবিমুখী হওয়া, হকের পৃষ্ঠপোষকতা না করা এবং দ্বীনের খেদমতে অলসতা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করা।

> মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "অপমান ও লাঞ্ছনা রাখা হয়েছে আমার আদেশের বিরোধিতাকারীদের জন্য।"[১]

এবার একটু লক্ষ করে দেখুন যে, যুবকরা আজ কতশত মতপার্থক্যের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে। নবিজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদশের থোড়াই কেয়ার করছে। যার ফলস্বরূপ, আমাদের এ-হেন শোচনীয় অবস্থা।

জনৈক ব্যক্তি হাসান আল বসরি রাহিমাহুল্লাহর কাছে এসে বলল, 'আমি সফরে যাবার ইচ্ছে করেছি, তাই আমাকে কিছু পাথেয় দিন (নাসিহা দিন)।'

হাসান রাহিমাহুল্লাহ তাকে বললেন, 'হে আমার ভায়ের ছেলে! যেখানেই থাক না কেন আল্লাহর আদেশকে বড় মনে করবে, তাহলে আল্লাহ তোমাকে বড় বানিয়ে দেবেন।'

আর আমি তার অসিয়তকে হিফাজত করলাম।[২]

এবার তাহলে সময়ের একটু পেছনে চলে যাওয়া যাক। মনে আছে আপনাদের ঐসকল সাহাবার কথা, যারা উহুদ যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি মাত্র আদেশের বিরোধিতা করেছিলেন। যার ফলস্বরূপ বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের পরাজয়বরণ করতে হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

যেদিন দু'দল একে অপরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল।[৩]

উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় সা'দি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

'আল্লাহ তাআলা এ আয়াতের মাঝে উহুদের দিন যারা পরাজিত হয়েছিল তার ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। নিশ্চয় তা হয়েছিল শয়তানের প্ররোচনা হতে এবং কোন অপরাধ তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করার কারণে।'[৪]

সুতরাং যুবকদের জন্য অপরিহার্য হল—আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ মান্য করে তাঁদের প্রতি সম্মান-সম্ভ্রম প্রদর্শন করা। তবেই কিনা ফিরে আসবে আমাদের হারানো নেতৃত্ব, ফিরে আসবে হারানো রাজত্ব।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করবেন, যে তাঁকে সাহায্য করবে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।[৫]

তিনি আরও বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

"হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সমূহ সুদৃঢ় করবেন।"[৬]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সা'দি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

'এটি হল আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের প্রতি আদেশ যে—মুমিনরা তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবে, মানুষকে তাঁর দিকে দাওয়াত দিবে এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁকে সাহায্য করবে। আর দাওয়াতের উদ্দেশ্য হতে হবে কেমলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। সুতরাং, যখনই তারা এ কাজগুলো বাস্তবায়ন করবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করবেন। অর্থাৎ, তাদের অন্তরে ধৈর্য, প্রশান্তি এবং ইমানে দৃঢ়তা দিয়ে তাদেরকে মুড়িয়ে দেবেন। তাদের শরীরকে করে দিবেন সহনশীল। তাদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন। সুতরাং, এটি হল প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণতকারী ঐ মহান সত্তার পক্ষ থেকে একটি ওয়াদা। নিশ্চয় যে তাঁকে কথা ও কাজের দ্বারা সাহায্য করবে তাকে তার রব শিগগিরই সাহায্য করবেন। তাদের জন্য বিজয়ের পথ সুগম করবেন এবং ইমানের উপর দৃঢ়পদ থাকতে সহজ করে দেবেন।'[৭]

তাই হে যুবসম্প্রদায়! কীভাবে ফিরবে আমাদের হারানো নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব? যখন কিনা আমরা রব্বুল আলামিনের আদেশের অবমাননা করছি, তাঁর রাসূলকে অপমান করছি এবং ক্রমাগত নাশ করে যাচ্ছি আমাদের দ্বীন-ধর্মকে। হায়, আফসোস!

তথ্যসূত্র:

১। আহমাদ: ৫১১৪-৫১১৫, ৫৬৬৭, শুআবুল ইমান: ৯৮, সহিহ আল জামে: ২৮৩১

২। কিতাবুয যুহদ লিআহমাদ বিন হানবাল

৩। সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১৫৫

৪। তাফসীরে সা'দী, সূরা আলে ইমরান, আয়াতঃ ১৫৫

৫। সূরা আল হাজ, আয়াত: ৪০

৬। সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ০৭

৭। তাফসীরে সা'দী সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ০৭

৬

মুসলিম যুবকদের দুরাবস্থা

হালের সিংহভাগ যুবকদের থেকে ইসলামি বৈশিষ্ট্য খসে পড়ছে, তারা দুনিয়ার তাবৎ মন্দ জিনিসের অনুসরণ ও অনুকরণ করছে। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল সংবাদ দিয়েছেন,

> 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে পুরোপুরিভাবে, প্রতি বিঘতে-বিঘতে এবং প্রতি গজে-গজে। এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তেও ঢুকে তবে তোমরাও তাতে ঢুকবে।'
>
> সাহাবারা জিগ্যেস করল, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি ইয়াহুদি ও নাসারার কথা বলছেন?' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তবে আর কার কথা?'[১]

বর্তমানের তরুণ-তরুণীদের দিকে তাকালে উল্লিখিত হাদিসের সত্যতার প্রমাণ খুব করে মেলে। ইদানীং-এর যুবকদের মাঝে যে দুঃসহ অবনতি পরিলক্ষিত, তার সার কারণ হচ্ছে—দ্বীন ইসলাম হতে তাদের বহুদূরে চলে যাওয়া। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস প্রমাণ করে যে, এই উম্মাহর মান-মর্যাদা উচ্চ আসনে থাকার মূলে রয়েছে ইসলামকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরা এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে বুকে ধারণ করা।

উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু যথার্থই বলেছেন,'আমরা ছিলাম সর্বনিকৃষ্ট জাতি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সম্মানীত করেছেন ইসলামকে দিয়ে। সুতরাং, যখনই আমরা ইসলাম ভিন্ন অন্য কিছুতে সম্মান খুঁজতে যাব আল্লাহ তাআলাও আমাদেরকে লাঞ্ছিত-অপদস্থ করবেন।'[২]

হাদিসে কুনুত যা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৌহিত্র হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শিক্ষা দিয়েছেন; সেখানে তিনি বলেন,

> 'নিশ্চয় যাকে তুমি বন্ধু ভেবেছ সে কখনও অপমানিত হয় না। আর সে কখনো সম্মানিত হয় না যাকে তুমি শত্রু ভেবেছ। তুমি কল্যাণময়, তুমি সুউচ্চ।'[৩]

তাই পুনরায় আমাদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও রাজত্ব ফিরে আসার পূর্বশর্ত হল, আমাদের রবের কাছে ফিরে আসা এবং তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করা।

তরুণদের থেকে আমরা আশান্বিত যে, খুব শিগগিরই তারা আখিরাতমুখী কাজে-কর্মে মনোনিবেশ করবে এবং হিদায়াতের পথ অনুসরণ করবে। আজ আমরা সেইসব মুসলিম তরুণদের বড় প্রয়োজন অনুভব করছি—যারা তার ধর্ম ও স্ব-জাতির প্রতি তার যে দায়-দায়িত্ব রয়েছে তার প্রতি যত্নবান হবে। সেসব মুসলিম তরুণদের চাহিদা অনুভব করছি—যারা স্বীয় কর্তব্য সম্পর্কে অবগত হবে এবং তাদের অধিকারসমূহ আদায় করে নিবে।

আমরা যুবকদের থেকে এটাও আশাবাদী যে, একটা সময় তারা স্বীয় দ্বীনকে নিয়ে গর্ববোধ করবে এবং জাতির জন্য কল্যাণকর কাজে এগিয়ে আসবে।

জনৈক কবি বলেন,

"হে তরুণ প্রাণ!
ফিরে এসে গাও ইসলামের জয়গান।
তোমরা আনবে মুক্তির সোপান,
করবে যবে নেতৃত্বের সুধাপান।
জাগরণে তোমরা সুপ্রাচীন শক্তি;
নবোদয়ের ঝাঁঝালো মহারথী।"

তাই ফিরে এসো হে যুবক তোমার আত্মপরিচয়ের দিকে, ফিরে এসো তোমার দ্বীনের দিকে। ইনশাআল্লাহ, একদিন আমরা সূচনা করব এক নতুন আরুশির, ফিরিয়ে আনব আমাদের হারানো গৌরব।

তথ্যসূত্র:

১। বুখারি: ৩৪৫৬, মুসলিম: ২৬৬৯
২। আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম: ২১৪, হাদিসটি শাইখাইনের শর্তানুপাতে সহিহ
৩। হাদিসাংশ; আবু দাউদ: ১৪২৫, তিরমিজি: ৪৬৪, নাসায়ি: ১৭৪৫, ইবন মাজাহ: ১১৭

৭

যুবাবস্থা—নেক আমলের এক সুবর্ণ সময়

যৌবনকালের সময়টা হল ধীশক্তির সুসময়। যুবাবস্থা দুই ক্ষীণতার মাঝামাঝি সময়ের নাম —

১. শিশুকাল ও
২. বার্ধক্যকাল।

এই দিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন,

اللهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

"আল্লাহ, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন দুর্বল বস্তু থেকে এবং দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দান করেন। আর শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। আর তিনিই সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাবান।"(১)

যৌবনকালই নেক আমল করার উপযুক্ত সময়

সুফিয়া বিনত সিরিন রাহিমাহুল্লাহ যুবকদের সম্বোধন করে বলেন,

'হে নওজোয়ানরা! যুবক অবস্থাতেই তোমরা তোমাদের ব্যাপারে মনোযোগী হও। আল্লাহর শপথ! যৌবনকাল ছাড়া অন্যকোন সময়ে আমি আমল করা দেখিনি (অর্থাৎ যৌবনকাল আমলের জন্য সবচেয়ে উপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়)।'(২)

তাই যৌবনকাল হল বিরাট একটা সুযোগ—অমূল্য সময় যার কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া যায় না; যার কোন বিনিময় হয় না। তাই প্রত্যেক নর-নারীর উচিত যৌবনকালকে দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণের কাজে ব্যয় করা। এ বিষয়টিকে লক্ষ রেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উপদেশ দিয়ে গেছেন। হাকিম রাহিমাহুল্লাহ তার মুস্তাদরাকে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস নকল করেছেন—

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে মূল্যবান মনে কর। এগুলো হল—

(১) "মৃত্যুর আগে তোমার দুনিয়ার জীবনকে মূল্যবান মনে কর,

(২) অসুস্থ হওয়ার আগে সুস্থতাকে মূল্যবান মনে কর,

(৩) ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার আগে অবসরকে মূল্যবান মনে কর,

(৪) বৃদ্ধ হওয়ার আগে যৌবনের সময়কে মূল্যবান মনে কর এবং

(৫) অভাবের আগে স্বচ্ছলতাকে মূল্যবান মনে কর।”[৩]

কবি যথার্থই বলেছেন,

যে দিনগুলি করছি পার, হচ্ছি খুশি বেশুমার;

প্রতিটি ক্ষণে মরণপানে হেঁটে যাই আমি বারংবার।

মরণের আগে তাই তুমি হে, আমলে যাও সবছাড়িয়ে;

লাভ-ক্ষতির হিসাব বাদ দিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছো দ্বীন হারিয়ে?

মৃত্যুর পূর্বে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাসবিহ পাঠ

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। এমন সময় তিনি বলেন, ‘আমাকে বসিয়ে দাও।’ এরপর তাকে বসানো হলো। তিনি আল্লাহর জিকির করতে লাগলেন। অতঃপর একপর্যায়ে নফসের বিরুদ্ধে বলে উঠলেন, ‘ধ্বংস ও অবক্ষয়ের পর এখন তুমি তোমার রবকে স্মরণ করছ হে মুআবিয়া! জেনে রাখো, এগুলো এবং কচি গাছের ডাল সতেজ-সবুজ ও কোমল।’ এই বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন, এমনকি তার গাল বেয়ে তপ্তাশ্রু ঝরতে লাগল। অবশেষে তিনি বললেন, ‘এ হল মৃত্যু, আর মৃত্যু থেকে রক্ষা নেই। মৃত্যুর পরে আমরা যার আশঙ্কা করছি তা অত্যন্ত বিভীষিকাময় ও কঠিনতম।’[৪]

মাওরিদি বলেন,

“তুমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতি মনোযোগী হও। কতো লোক এমন রয়েছে যারা সকালে উপনীত হয়েছে কিন্তু হতে পারে তারা সন্ধ্যায় উপনীত হতে পারবে

না। নতুন দিনকে তুমি বরণ করে নাও তাওবার দ্বারা। যা তোমার গতকালের আমলনামার গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়। অবশ্যই অন্ধকার তোমার সজীব-সুন্দর চেহারাকে জীর্ণ বানিয়ে দেবে। যেমন অন্ধকার সে সূর্যের চেহারাকে জীর্ণ করে দেয়। দিনে ঠিক যেমন দাপুটে সূর্যটি উজ্জ্বলভাবে জ্বলে, অতঃপর যেমনি আঁধার ঢেকে যায় তার আলোকরশ্মি, তেমনি যৌবনের শুরুতে যুবকের চেহারায় দেখা যায় যৌবনের তেজোদ্দীপ্ত প্রভাব, কিন্তু একসময় তার যৌবনেও ভাঁটা পড়ে, পতিত হয় বার্ধক্যে; ফলে নিঃশ্বেষ হয় তার যৌবনের সজীবতা।"

সুতরাং যে ব্যক্তি জানবে—যৌবনকালটা ঐ মেহমানের ন্যায় যা কখনো ফিরে আসার নয়, এমন এক মূল্যবান সম্পদ যার কোন বিনিময় হয় না, সে চাইবে তার যৌবনকালকে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার আনুগত্যে সাজাতে, সদা-সচেষ্ট হবে তাঁর ইবাদত-বন্দেগি করতে। অন্যদিকে যৌবনকালকে যে অবহেলা করে, তার সুষম পরিচর্চা না করে অলসতা করে, তার যৌবনকাল শেষ হয় তার নফস ও কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে করতে, ফলে সে নিজেই নিজের প্রতি লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়, হেয় করে নিজেকে। কিন্তু তখন তার সেই অনুশোচনা কোন কাজে আসে না; আসে না কোন উপকারেও।"[৫]

তাই জাতির কর্ণধার যুবক ভাইয়েরা আমার!

আজ যদি তোমরা তোমাদের নফস ও কু-প্রবৃত্তির উপর বিজয়ী না হও, শাহওয়াত-খাহেশাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ না হও এবং তোমাদের সুন্দর ও আলোকিত জীবনকে দ্বীন-ইসলাম ও জাতির কল্যাণে ব্যয় না কর তাহলে আর কবে করবে শুনি?!

তথ্যসূত্র:

১। সুরা আর রুম, আয়াত: ৫৪
২। সিফাতুস সাফওয়াহ
৩। সহিহ আল জামি: ১০৭৭, মুসনাদে আহমদ, নাসায়ি, সহিহ আত-তারগিব: ৩৩৫৫
৪। তাসলিয়াতু আহলিল মাসাইব, পৃ. ৮৭
৫। আদাবুদ দুনইয়া ওয়াদ দ্বীন, পৃ. ৬৩

৮

যুবকদের সময়ের অবমূল্যায়ন

অবসর সময় আল্লাহর পক্ষ হতে নিআমত যদি সেই সময়টাকে আল্লাহর ইবাদতের মাঝে ব্যয় করা যায়। বাস্তবিকপক্ষেই পৃথিবীতে সময়ের চেয়ে দামি আর কোনোকিছুই নেই। সময়ের বিনিময়ে মানুষ কিনে নেয় চিরস্থায়ী নিআমত সমৃদ্ধ জান্নাত, যা কেবল অর্জন করা যায় সময়ের সুষম ব্যবহার করার মাধ্যমে। পার্থিব এ জীবনে ঈমানের পর সবচেয়ে বড় নিআমত হল সুস্থতা এবং অবসরতা।

সহিহ বুখারিতে এসেছে, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,

> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দুটি নিআমতের ব্যাপারে মানুষ সবচেয়ে বেশি অবহেলা করে; তা হল, সুস্থতা এবং অবসরতা।'[১]

ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

'কখনো মানুষ সুস্থ থাকে অথচ তখন সে জীবিকা নির্বাহে ব্যস্ত হয় না। আবার কখনো মানুষ অসুস্থ থাকে অথচ তখন কামাই রোজগার করা থেকে বিরত থাকে না। সুতরাং যখন উভয়টিই (তথা অবসরতা ও সুস্থতা) একত্রিত হয়ে যায় তখন আল্লাহর আনুগত্য থেকে অলসতা তার উপর প্রবল হয় (অর্থাৎ সে আলসেমি করে), ফলে সে হয় ধোঁকাগ্রস্ত। আর এতসব কিছু হওয়ার কারণ হল, দুনিয়াটা আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। এখানে রয়েছে এমন ব্যবসা যার লাভ মিলবে আখিরাতে। তাই যে ব্যক্তি তার সুস্থতা ও অবসরতার সময়কে আল্লাহর আনুগত্যের মাঝে কাজে লাগাবে সেই সৌভাগ্যশালী। আর যে ব্যক্তি তার অবসরতা ও সুস্থতার সময়কে আল্লাহর অবাধ্যতায় ও নানান পাপকাজে নষ্ট করবে, সে হলো ধোঁকাগ্রস্ত। কেননা অবসরতা মিলে ব্যস্ততার পরই, আর সুস্থতা আসে অসুস্থতার পরই।'[২]

ইবন রজব হানবালি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

'সুস্বাস্থের দিনগুলো মূল্যবান গনিমত এবং সুস্থতার সময়গুলো কল্যাকর কাজের জন্য কোন তুলনা নেই। তুমি অর্জন কর যতক্ষণ তোমার কাছে থাকে দস্তরখান। আর চলে যাওয়া সময়গুলো কখনো ফিরে আসার নয়।'[৩]

আমাদের পূর্ববর্তী মুসলিম মনীষী, আকাবির ও সালাফ আস-সালিহিনগণ সময়ের তাৎপর্যের প্রতি বেশি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আবু মুসলিম আল খাওলানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

'আমি যদি জান্নাত ও জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখতে পেতাম, তাহলে জান্নাতের চেয়ে অধিক আর কিছু আমার চাওয়ার থাকতো না।"[৪]

সময়ের মূল্যায়ন সংক্রান্ত টুকরো টুকরো কিছু গল্পকথন

১। জনৈক ব্যক্তি আমির বিন কায়সকে বলেন, 'একটু দাঁড়ান তো, আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই।' তখন তিনি লোকটিকে বললেন, 'আগে সূর্যকে (সময়কে) থামিয়ে দাও।'[৫]

২। দাউদ আতত্বাই রাহিমাহুল্লাহ রুটি গলানো ছাতু গিলে ফেলতেন। তিনি নিজেই এ সম্পর্কে বলেন, 'রুটি এবং ছাতু খাওয়ার মাঝে পঞ্চাশ আয়াত পড়ার সমপরিমাণ সময়ের ব্যবধান রয়েছে।'[৬]

৩। আবু বকর বিন ইয়াশ রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তার বোন কাঁদতে লাগল। তখন তিনি বললেন, 'কাঁদছো কেন? কাঁদার তো কোন দরকার নেই।' এরপর ঘরের এক কোণের দিকে ইশারা করে বলেন, 'তোমার ভাই, ঐ কোণায় আঠার হাজারবার কুরআন খতম করেছে।'[৭]

৪। সাইদ বিন আবদুল আজিজ বলেন, আমি উমাইর বিন হানিকে জিগ্যেস করলাম, 'আমি লক্ষ করেছি যে, আপনার জিহ্বা একমুহূর্তের জন্যেও জিকিরশূন্য থাকে না। আচ্ছা, আপনি প্রতিদিন কতবার তাসবিহ পাঠ করেন?' তখন তিনি বললেন, 'প্রতিদিন আমি (উমাইর) একলক্ষ বার তাসবিহ পাঠ করি।'(৮)

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> 'যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহিল আজিম ওয়াবিহামদিহি বলে, তার জন্য জান্নাতে একটি গাছ লাগানো হয়।' (৯)

৫। ইমাম ইবন তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর দাদা আবুল বারাকাতের ব্যাপারে জানা যায় যে, তিনি যখন গোসলের জন্য হাম্মামে যাবার ইচ্ছে করতেন তখন তিনি তার ছেলেকে ডেকে এনে বলতেন, 'বাবা আমার, তুমি হাম্মামের দরজার সামনে বসে জোরেসোরে পড়তে থাক। (তারপর সে হাম্মামের বাইরে থেকে জোরেজোরে পড়তে থাকতো, এমনকি তিনি ভিতরে থাকার পরেও তা শুনে শুনে মুখস্থ করে নিতেন।)'

কবি কতই না সুন্দর বলেছেন,

"চলে গেল আমার থেকে একটি দামী দিন,
রইলাম আমি আল্লাহ্ ভুলে হিদায়াত বিহীন;
করলাম না আমি ইলম অর্জন,
এটাই সময়, এটাই জীবন।"

আজকের যুবকদের অন্তর থেকে নির্ভীকতা উধাও হয়ে গিয়েছে। দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়েছে তাদের দৃঢ়প্রত্যয়গুলো। তাদের অন্তরে দানা বেঁধেছে আরাম-আয়েশ, আশ্রয় নিয়েছে তাদের শরীরে অলসতার ব্যাধি।

তরুণরা একে-অন্যের সাথিকে ডেকে ডেকে বলছে, আসো আমরা টাইমপাস করি! সোজাকথায় অমূল্য সময়গুলিকে গলা টিপে হত্যা করি। কতো কতো সময় দেদারসে চলে যাচ্ছে তার কি কোন হিসেব রাখা হচ্ছে আমার যুবক ভাইয়েরা? সময়গুলো নষ্ট হচ্ছে—খেলা দেখায়, পথে-পথে আড্ডাবাজী করে এবং ললনাদের সাথে ফোনালাপ করে। সময় খুইয়ে যাচ্ছে অযথা ইন্টারনেটে ব্রাউজিং, ফেসবুক-টুইটার-ইউটিউব ইত্যাদির মাধ্যমে।

এসমস্ত ঘটনা বান্দার উপর আল্লাহর অসন্তোষের প্রমাণ বহন করে। যেমনটি বলা হয়, অসন্তোষের নমুনা হল সময়ের অপচয় করা।

মুমিনের কোন ফুরসত বা অবসরতা নেই। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۞ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب

অতএব, যখনই তুমি অবসর পাও তখনই ইবাদতে রত হও, আর তোমার রবের দিকে মনোনিবেশ কর। (১০)

ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

"আমি সুফিদের সাথে থেকেছি। তাদের থেকে আমি দুটি কথার উপকার পেয়েছি। তাদেরকে আমি বলতে শুনেছি, সময় হল তরবারির মত, সুতরাং তুমি যদি তাকে না কাট তাহলে সে তোমাকে কেটে ফেলবে। অন্য কথাটা হল, নফসকে যদি হক কাজে না লাগাও তাহলে সে তোমাকে বাতিল কাজে লাগিয়ে দেবে।"(১১)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ মাদারিজুস সালিকিনের মাঝে ইমাম শাফিয়ির উপর্যুক্ত উক্তির টীকায় লিখেন,

'আহ, কথাদুটো কতইনা উপকারী, কতইনা ফলপ্রসূ। কথাদুটো কতটা উঁচু হিম্মতের ও কতইনা সুন্দর হিদায়াত-বাণী যা তিনি বলেছেন এবং সতর্ক করেছেন।'(১২)

আজ-কালের যুবকরা সময়ের মূল্যায়নের ব্যাপারে এতোটাই অজ্ঞ যে, প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর তারা ভীষণ আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ে। অথচ একটুও অনুধাবন করে না—এই মুহূর্তটি তার জীবন থেকে ঐ দিনের শেষ সময়, যা আর কস্মিনকালেও আর ফিরে আসবে না তার কাছে। ঐ অস্ত যাওয়া দিনটি তার জীবন-নামচার একটি পৃষ্ঠা যেন, যা ভাঁজ হয়ে গেছে, আর কখনো খুলবে না তা।

তথ্যসূত্র:

১। সহিহ বুখারি: ৬৪১২
২। ফাতহুল বারি লিল ইমাম ইবন রজব হাম্বলি
৩। আল মুদহিশ, ৬৮২
৪। সিফাতুস সফওয়া, ২/২৮৪
৫। সিফাতুস সফওয়া, ২/২৮৪
৬। ইয়াহইয়া উলূমিদ্দীন, ৩১৯
৭। শারহু সহীহ মুসলিম লিন-নাবাবী, ১/৭৯
৮। আল-গাদীর ফিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, ৩৩
৯। তিরমিজি: ৩৪৬৪, মুসনাদে বাযযার: ২৪৬৮
১০। সুরা আল ইনশিরাহ, আয়াত: ৮
১১। মাদারিজুস সালিকীন, ৩/১৩৯
১২। মাদারিজুস সালিকিন: ৩/১২৯

৯

প্রশ্নবিদ্ধ যুবাকালের আচরণ

যৌবনকাল মানুষের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। ভীষণ মর্যাদাময় একটা সময়। আর তাই যুবাবয়সের ব্যাপারে মানুষকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে।

তিরমিজিতে এসেছে,

> আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা ব্যতিত কারো এক পাও এগুবে না। প্রশ্নগুলি হল—
>
> ১. ব্যক্তির হায়াত সম্পর্কে, সে তা কীসের মাঝে শেষ করেছে।
>
> ২. তার যৌবনকালের ব্যাপারে, সে তা কোথায়, কীভাবে কাটিয়েছে।
>
> ৩. তার সম্পদের ব্যাপারে, সে তা কোথা থেকে উপার্জন করেছে।
>
> ৪. কোথায় ও কোন কাজে সেই সম্পদ ব্যয় করেছে এবং
>
> ৫. ইলম অনুযায়ী আমল করেছে কিনা। অন্য বর্ণনায় আছে, যা জেনেছে সে অনুযায়ী আমল করেছে কিনা?' [১]

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসতে পারে, সমগ্র জীবনকালের কথা উল্লেখ করার পর যৌবনকালের কথা কেন আবার আলাদা করে জিগ্যেস করা হল, অথচ যৌবনকাল মানুষের জীবনকালেরই একটা অংশ যখন!

এর উত্তর হল, গোটা জীবন নিয়ে জিজ্ঞাসার পরও বিশেষভাবে যৌবনকালের ব্যাপারে বলা হয়েছে কেবল তার বিশেষ মর্যাদার কারণে। কেননা পূর্ণ আয়ুষ্কালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হল যৌবনকাল। আর তাই এই গুরুত্বপূর্ণ কাল তথা যৌবনকালের ব্যাপারে আমরা বিশেষভাবে জিজ্ঞাসিত হব।

সুতরাং জেনে রাখো হে যুবক! অবশ্যই একদিন তুমি তোমার এই যৌবনকালের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। কী করছ তুমি এ মহামূল্যবান সময়টিতে? প্রস্তুতি নিয়ে রাখো এ প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য। আর মনে রেখো, জবাব যেন সঠিক হয়। সুতরাং এখন তোমার করণীয় হল, মহা-মহিম রবের রঙে এখুনি নিজেকে রাঙিয়ে নাও। পুরোপুরিভাবে নিজেকে সঁপে দাও তাঁর ইবাদত-বন্দেগিতে।

তথ্যসূত্র:

১। তিরমিজি: ২৪১৭

১০

যুবসমাজের অবক্ষয়ের স্বরূপসন্ধান

যুবকরা তাদের যৌবনের দ্বারা ধোঁকায় যেন না পড়ে; অন্যথায় অতিলিপ্সায় ভুগবে এবং খারাপ কাজে লিপ্ত হবে। হালের যুবকদের হাল-অবস্থার দিকে তাকালে দেখা যাবে—তাদের মাঝে আসন গেড়ে বসেছে আত্মগরিমা ও অহংবোধ। আরও দেখা যাবে তারা বিকৃত কামনা-বাসনায় উন্মত্ত এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে সদা ব্যতিব্যস্ত। স্বীয় প্রতিপালকের বন্দেগি হতে বিমুখ। এর সার-কারণ হল, তাদের প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষ ও অতিলিপ্সা।

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ কতই না সুন্দর বলেছেন, 'বান্দার উচ্চাকাঙ্খা-উচ্চাভিলাষ কেবল আমলকেই খারাপ করে।'[১]

হাসান বসরি যথার্থই বলেছেন বটে। ব্যাকুল কামনা আল্লাহর আনুগত্য অনুসরণে কমতি আনে, তাঁর ইবাদত হতে অলসতা তৈরি করে। অতি-আশা অন্তর কঠোর বানিয়ে দেয়, প্রায়শ্চিত্তের কথা ভুলিয়ে দেয়। ফলস্বরূপ, অধিক পরিমাণে মন্দকাজে লিপ্ত হবার বাসনা জাগে; দুনিয়ার প্রতি মোহাচ্ছন্ন হয়ে মৃত্যুর ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ে। যার মধ্যে এসব জোরালোভাবে উপস্থিত সত্যিই তার দুর্ভাগ্য; পার্থিব-পরকালীন দু'জীবনেই।

ফুদাইল ইবন ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় দুর্ভাগ্য হল অতি-লিপ্সা, আর সৌভাগ্য হল অপ্রচুর আশা করা।'[২]

স্বল্প আশান্বিত ব্যক্তি—মৃত্যুনামা যে সময়েই আসুক না কেন, তার জন্য সদা প্রস্তুতি নিয়ে রাখে। যে অতিলিপ্সিত নয় সে দেখবে, তার মরণ খুব কাছেই; তাই সে একটু একটু করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখে। আর এ বিষয়টি প্রস্বস্তিদায়ক অন্তরের জন্য অধিক উপকারী। নিশ্চয় মানুষকে পাঠানো হয়েছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে তার যথাযথ ব্যবহার করার জন্য।

সুতরাং যুবক ভাইয়েরা আমার, অতি-লিপ্সা হতে বেঁচে থাক, নয়ত মৃত্যু এসে একদিন ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে তোমায়।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

> "একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রেখা টেনে বলেন, 'এটি হল মানুষ।' তার পাশে আরেকটি রেখা টেনে বলেন, 'এটি তার মৃত্যু।' এরপর আরও একটা রেখা তার চেয়ে একটু দূরে টেনে বলেন, 'এটি হল তার আশা-আকাঙ্খা।"[৩]

ইমাম তিরমিজি ও ইমাম নাসায়ি রাহিমাহুল্লাহ প্রমূখ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'একদিন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং এর মধ্যখানে একটি রেখা টানলেন, যা তাথেকে বের হয়ে গেল। তারপর দু'পাশ দিয়ে মধ্যের রেখার সঙ্গে ভেতরের দিকে কয়েকটা ছোট ছোট রেখা মিলালেন এবং বললেন, 'এ মাঝের রেখাটা হলো মানুষ। আর এ চতুর্ভুজটি হলো তার আয়ু, যা বেষ্টন করে আছে। এবং বাইরে বেরিয়ে যাওয়া রেখাটি হলো তার আশা। আর এ ছোট ছোট রেখাগুলো বাধা-বন্ধন। যদি সে এর একটি এড়িয়ে যায়, তবে আরেকটি তাকে আক্রমণ করবে। আর আরেকটি যদি এড়িয়ে যায় তবে আরেকটি তাকে আক্রমণ করবে।'[৪]

জনৈক বলেন, আজকের কত ভবিষ্যত প্রত্যাশী তার দিনকে পূর্ণ করতে পারেনি, আর কত আগামীর প্রত্যাশী তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি।

মায়মুন বিন মিহরান রাহিমাহুল্লাহর এক মজলিসে যুবক-বৃদ্ধ উভয় দলেরই লোক ছিল, তিনি বলেন, 'হে বৃদ্ধগণ, যখন ফসল পেকে সাদাবর্ণ ধারণ করে তখন আর কীসের অপেক্ষা করা হয়?' সবাই বলল, 'ফসল কাঁটার অপেক্ষা করা হয়।' তারপর তিনি যুবকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে যুবকদল, নিশ্চয় ফসল কাঁটার পূর্বে তার উপর বাতাসসহ ইত্যাদির দুর্যোগ বয়।'[৫]

জনৈক কবি বলেন,

হে বনি আদম! তোমার সুস্বাস্থ্য যেন দেয়না তোমায় ধোঁকা,

তুমিতো কেবল শস্যক্ষেতের ফসল থোকা থোকা।

অচিরেও তোমায় কেটে ফেলা হবে দুর্যোগের ঘনঘটা। (৬)

তাই হে তরুণদল, তোমার তেজোময় যৌবন আর সুস্থতা তোমাকে যেন ধোঁকায় ফেলতে না পারে। অন্যথায় তুমি জীবনচলার পথে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়বে। আর বেমালুম ভুলে যাবে অতর্কিতে মৃত্যুর আগমনের কথা।

জনৈক লোক বলেন, 'কত সুস্থ, সবল নিরোগের মৃত্যু সংবাদ শুনলাম আর কত রুগ্ন, অসুস্থকে দেখলাম যাদের হায়াত দীর্ঘ হয়েছে। আর কত যুবক, ছোট বাচ্চা, দুধের শিশু চলে গেছে কবরে!'

হাকিম আবু আবদুল্লাহ নিসাপুরি তার ভাইকে লিখেছেন— 'জেনে রেখো, যৌবনকালেই মৃত্যুর আশঙ্কা বেশি। তার নিদর্শন হল, বৃদ্ধদের সংখ্যা কমে যাওয়া।'

তাই হে আমার যুবক ভাইয়েরা! তোমরা কাজ-কর্মকে মুলতবি করা, অতি-লিপ্সা এবং আমলহীন বসে থাকা হতে বেঁচে থাক। কেননা এর পরিণতি হল নিজে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিনাশ হওয়া।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'হাততালি দেয়া হিসেবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ঐ ব্যক্তি, যে তার দুহাত ব্যয় করেছে তার কামনা-বাসনার পেছনে। অথচ সে তার জীবনের দিনগুলোতে তার আশা-আকাঙ্খার বাস্তবায়নে কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেনি। সুতরাং, সে দুনিয়া হতে বিদায় নেবে রিক্তশূন্যাবস্থায় এবং আল্লাহ তাআলার সামনে সে আসবে কীর্তিহীন।' (৭)

তাই যুবকদের এখন করনীয় হল, পেছনে যা হয়ে গেছে তার সংশোধন করা, প্রায়শ্চিত্ত করা। আর প্রতিনিয়ত সৎকর্ম করার মাধ্যমে পরজীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّٰلِحِينَ

আর আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তোমরা তা থেকে ব্যয় করবে তোমাদের কারও মৃত্যু আসার আগেই। অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে, হে আমার রব, আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকাহ দিতাম ও সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'[৮]

ইবন কাসির রাহিমাহুল্লাহ উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী ও পাপাচারী ব্যক্তিই মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে আল্লাহর কাছে দীর্ঘ হায়াতের আবেদন করে।'[৯]

সুতরাং হে আমার যুবক ভাই! জেনে রাখো, দুনিয়ার জীবন যতই লম্বা হোক না কেন, আদতে তা কিন্তু অতিসংক্ষিপ্ত। আর দুনিয়া যতই বড় হোক না কেন, তা অতি তুচ্ছ জিনিস। রাত যতই লম্বা হোক না কেন, তার শেষে অবশ্যই ভোর উদিত হয়। আর আয়ুষ্কাল যতই দীর্ঘ হোক না কেন, কবরে অবশ্যই প্রবেশ করতে হবে। অথচ আজ কত মানুষ দুনিয়ার পেছনে ছুটে চলছে নিরবধি এবং আগামীতেও কত ছুটতে থাকবে নিরন্তর!

কবি যথার্থই বলেছেন,

তাকওয়া বাড়াও, তুমি জানোনা কতটুকু রাত আছে হাতে বাকী,

রাত কেটে এই ভোর হল বুঝি সে খেয়াল আছে নাকি?

কতো যে যুবক সন্ধ্যা কাটিয়ে সকালে গিয়েছে মরে;

জানতো কি সে শীঘ্রই সে পেচিয়ে যাবে কাফনের কাপড়ে?

স্বামীর জন্য সাজলো যে কতো প্রেয়সী নববধু,

বাসর রাতেই কব্জা হলো তাদের আশাময় রুহ।

কতো বালকের স্বপ্ন ছিল দীর্ঘ হায়াতের,

আঁধার কবরে সঙ্গী তারা সহস্র মাইয়াতের।

কতো যে সুস্থ সবল ব্যক্তি মরেছে বালাই ছাড়াই;

কতো যে রুগ্ন বেঁচে আছে বেশ করছে ভীষণ বড়াই।

ইদানীং অকস্মাৎ মৃত্যুর বিষয়টি প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের অন্যতম। তাবারানিতে উল্লেখ আছে, নিশ্চয় কিয়ামতের নিদর্শনের একটি হল, হঠাৎ মৃত্যু আচানক প্রকাশ পাওয়া।[১০]

আর এখন তো অকস্মাৎ মৃত্যু আসাটা যুবকদের মাঝে গণহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি আরও একটু বাড়িয়ে বলি, ব্যক্তি যে জিনিসের আশা নিয়ে বাঁচে তার ওপরই তার মৃত্যু এসে যায়। আর ব্যক্তি যে অবস্থার ওপর মৃত্যুবরণ করে তার পুনরুত্থান সেভাবেই হবে।

পরিশেষে, যুবকদের প্রতি লক্ষ রেখে একটি প্রশ্ন করছি, তোমরা আসলে কী চাও? তোমরা জিনা-ব্যভিচার ও পাপাচার করতে চাও নাকি পয়সা-কড়ি ও মাদকদ্রব্য চাও? কিন্তু এরপরে কী চাও?

সুতরাং, যে স্বাদ আস্বাদনের পর রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তাতে কীই-বা আর কল্যাণ রয়েছে? এসব মোজ-মাস্তি ও ভোগ্যসামগ্রী কোনভাবেই জাহান্নামে নিমজ্জিত হওয়ার সমান হবে না।

সহিহ মুসলিমে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদিসে আছে,

> কিয়ামতের দিন দুনিয়াবাসীর মাঝে যারা জাহান্নামী তাদের নিআমতগুলি আনা হবে, এরপর তা জাহান্নামে ঢেলে দেওয়া হবে। তারপর বলা হবে, 'হে আদম সন্তান, তুমি কখনও কল্যাণ দেখেছ? কখনও তোমাকে নিয়ামত অতিক্রম করেছে?' সে বলবে, 'না। আল্লাহর কসম, আমরা কখনও কোন কল্যাণ দেখিনি, আর আমাদেরকে কোন নিয়ামত অতিক্রমও করেনি।'[১১]

হে আমার প্রিয় ভাই! তোমার জন্য আবশ্যক, দুনিয়াতে তোমার আসার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে জেনে নেওয়া। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার আনুগত্য ও তাঁর ইবাদত করাই হলো আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আর আমি সৃষ্টি করেছি জ্বীন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে।"[১২]

কেবল খেলাধুলা আর আনন্দ-বিনোদন করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি আমাদের। কোন কারণহীন অহেতুক সৃষ্টি করা হয়নি। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না? [১৩]

সহিহ সনদের এক হাদিসে এসেছে যে,

> "বাচ্চারা নবি ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া আলাইহিস সালামকে বলল, 'চলুন আপনার সাথে আমরা খেলাধুলা করব। তখন ইয়াহইয়া বলেন, 'না, আমাকে খেলাধুলা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।'[১৪]

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহর সাথেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ছোট বাচ্চারা তাকে মারত তাদের সাথে খেলাধুলা করার জন্য। আর তিনি কেঁদে কেঁদে বলতেন, 'আমাদেরকে খেলাধুলা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।'

তাই হে যুবক, ফিরে এসো মহা-মহিম রবের পথে। সময় যে নেই আর, এখনই তাওবা করে নাও দয়াময় রবের কাছে। আর নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী।

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে বলছেন,

قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

"তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ—আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৫]

হাদিসে কুদসিতেও আল্লাহ তাআলা বলেন,

> 'হে আদম সন্তান! যখনই তুমি আমাকে ডাকবে, আমার কাছে ফিরে আসবে, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, তা তুমি যত গুনাহই কর না কেন আমি পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান! যদি তোমার পাপ পৌঁছে যায় উর্ধ্বাকাশ পর্যন্ত, অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও; তবু আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, কোন পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান! যদি তুমি জমিন পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে আস এমতাবস্থায় যে তুমি আমার সাথে কাউকে শরিক করনি; তাহলে আমি সে পরিমাণ গুনাহও মাফ করে দেব।'[১৬]

মহান রবের পথে প্রত্যাবর্তনকারী হে যুবক, সুসংবাদ দিচ্ছি তোমায়—খুব শিগগিরই হাশরের ময়দানে তুমি সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদেরকে সেদিন আল্লাহ তাআলা তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন।

সহিহ মুসলিমে এসেছে,

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তারা হলেন,

(১) ন্যায়পরায়ণ শাসক,

(২) ঐ যুবক যে আল্লাহ তাআলার ইবাদাতে জীবনযাপন করেছে,

(৩) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদে বাঁধা থাকে,

(৪) ঐ দু'জন ব্যক্তি যারা একে-অপরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুহাব্বত করে; এ লক্ষ্যেই তারা একত্রিত হয় এবং এ লক্ষ্যেই পরস্পর পৃথক হয়,

(৫) ঐ ব্যক্তি যাকে সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত কোন রমণী অপকর্মের জন্য আহ্বান করে, আর সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি,

(৬) ঐ ব্যক্তি যে দান-সাদাকাহ্ করে এমন গোপনীয়তার সাথে যে, তার বামহাত জানে না যে তার ডানহাত কী দান করেছে এবং

(৭) ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর স্মরণ করে অতঃপর তার দুচোখ অশ্রু প্রবাহিত করে।"[১৭]

হাশরের ময়দানে সকল মানুষ বিবস্ত্র অবস্থায় অবস্থান করবে। সেদিন সূর্য তাদের মাথার এক বা দুই বিঘত পরিমাণ উপরে অবস্থান করে তার পুরো তাপ বিকিরণ করতে থাকবে। আর প্রত্যেকেই স্বীয় কর্মানুপাতে ঘামের মাঝে হাবুডুবু খেতে থাকবে। এভাবে সেখানে অবস্থান করতে হবে একটানা পঞ্চাশ হাজার বছর। উফ, কী ভীষণ বিভীষিকাময় সেই দিনটি! সেই বিভীষিকাময় সমাবেশের দিন ঐ যুবক আল্লাহর আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে যে তার যৌবনকালে আল্লাহর ইবাদাতে কাটিয়েছে; আর সেদিন তো তাঁর ছায়া বিনে অন্যকোন ছায়া থাকবে না। সেই যুবক সেদিন তার আমলনামা ডানহাতে গ্রহণ করবে এবং তার মিজানের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। হাশরের মাঠে সেই যুবক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বীয় হাতের কাওসার পানপাত্র হতে সুপেয় পানীয় পান করবে;

যা পান করলে আর তৃষিত হবে না কোন অন্তর। দ্রুতবেগে সিরাত পাড়ি দিয়ে চলে যাবে সে; যা তরবারির চেয়ে ধাঁরালো এবং চুলের চেয়ে চিকন হবে। আর সে পৌঁছে যাবে এমন জান্নাতের মাঝে; যা আসমান ও জমিন অব্দি পরিব্যাপ্ত।

সহিহ বুখারিতে এসেছে,

> আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমার উম্মতের প্রত্যেকেই জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল যে অস্বীকার করবে সে ব্যতীত।' জিগ্যেস করা হল, 'কে অস্বীকার করবে হে আল্লাহর রাসুল?' রাসুল বলেন, 'যে আমার অনুসরণ করেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্যতা করল প্রকারান্তরে সে অস্বীকার করল।'[১৮]

জনৈক কবি ঠিকই বলেছেন,

যে ঈমানকে বানিয়েছে তার দিশাকর,

ইহ ও পরজীবনে হবে সে সম্মানের কারিকর।

আমি তোমাকে আরো সুসংবাদ দিচ্ছি হে আনুগত্যশীল যুবক! অচিরেই তুমি জান্নাতের মাঝে ইল্লিয়্যিনের উঁচু স্তরে সকল আম্বিয়া ও রাসুলদের সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

আর যারা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন নবি, সিদ্দিক, শহিদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। আর সাথি হিসেবে তারা হবে উত্তম।[১৯]

ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে নিআমতের আধারে ঘেরা জান্নাতের মাঝে আপনি একত্রিত করুন নবিগণ, সিদ্দিকগণ ও শুহাদা এবং সালিহিনদের সাথে। আর আমাদেরকে আপনার দর্শনের স্বাদ আস্বাদন করান হে আমাদের প্রভু। আমিন।

তথ্যসূত্র:

১। আযযুহুদ লিল হাসান আলা বসরি: ৮২
২। আল-জামি লিশুআবিল, ১০২৯৮
৩। সহিহ বুখারি
৪। বুখারি: ৬৪১৭, তিরমিযি: ২৪৫৪, ইবন মাজাহ: ৪২৩১, আহমদ: ৩৬৪৪, ৪১৩১, ৪৪২৩
৫। লাতাইফুল মাআরিফ, ২/৫১১
৬। লাতাইফুল মাআরিফ: ৫৩৯
৭। ইবনু নাজ্জার
৮। সূরা আল মুনাফিকুন, আয়াত: ১০
৯। তাফসির ইবন কাসির ৮/১৩৩
১০। তাবারানি
১১। সহিহ মুসলিম। রাবীঃ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু।
১২। সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬
১৩। সূরা আল মুমিনুন, আয়াত: ১১৫
১৪। আল খারাইতি মাসাউইল আখলাক গ্রন্থে বর্ণনাটি এসেছে। ইবন জারির (রহ) বর্ণনা।
১৫। সূরা আয যুমার, আয়াত: ৫৩
১৬। সহিহ আল জামে: ৩৩৮২
১৭। বুখারি: ১৪২৩, মুসলিম: ১০৩১
১৮। সহিহ বুখারি: হাদিস নং ৬৮৫১
১৯। সূরা আন নিসা, আয়াত: ৬৯

নিশুতিকথন

এই পুস্তিকায় যা কিছু ঠিক নিশ্চয় তা আল্লাহর পক্ষ হতে, এবং ভুলচুক যা হয়েছে তা আমার পক্ষ হতে ও শয়তানের পক্ষ হতে; আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। মানুষ মাত্রই ভুল করে আর আমিও ভুলত্রুটির উর্ধ্বে নই। তাই এ পুস্তিকায় উপকারী কিছুর হদিস পেলে আমার জন্য দুয়া করবেন। আর যদি তাতে ভুল-ভ্রান্তি মেলে তাহলে আমার জন্য অনুগ্রহ করে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। জাজাকুমুল্লাহু খায়রান।

জনৈক কবি বলেন,

পাও যদি তুমি দোষ-ত্রুটি তা করিও নষ্ট ও বিকৃতি,

মহিমান্বিত হয়েছে সে যার মাঝে নেই কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি।

হে আল্লাহ, আপনি আমার সকল আমলকে নেক আমল বানিয়ে দিন এবং সকল আমল কেবলমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্যেই কবুল করে নিন। আমিন।
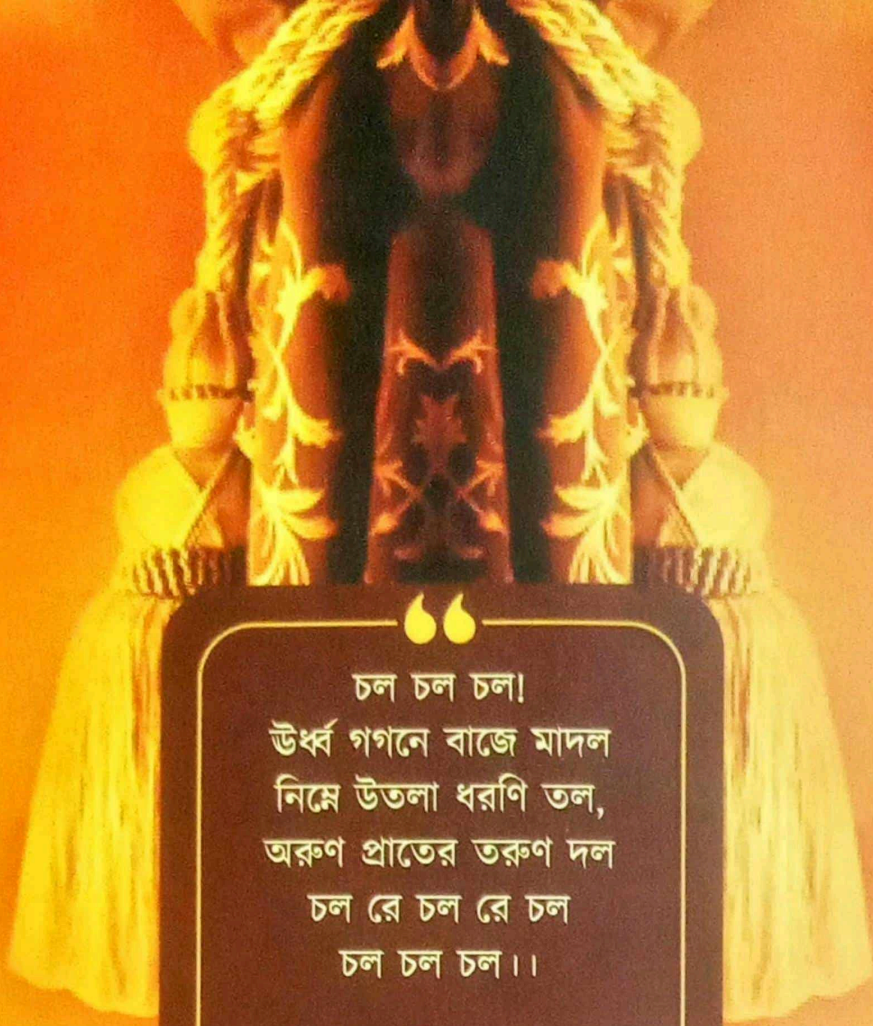
আমাদের সকল বই সম্পর্কে জানতে QR স্ক্যান করুন

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
০১৭৫৯৫৯৯০০৮, ০১৭১৭৩১৭৯৩১
facebook.com/AzanProkashoni